দুর্বার ভাবনা

বর্ষ : ৪ সংখ্যা : ১২ □ এপ্রিল ২০১৩

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ... শাহবাগ ও ধর্মযুদ্ধ ...১
প্রচ্ছদ নিবন্ধ : বাংলাদেশ ও শাহবাগ আন্দোলন
শাহবাগ ও নবীন প্রজন্ম...বিপ্লব মাজী ... ৪
শাহবাগ আন্দোলনের প্রেক্ষিত, ভবিষ্যৎ ও বামপন্থীদের ভূমিকা... চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য... ৫
বিশেষ নিবন্ধ : ব্রাত্যজন-কথা
শবর পরিচিতি ... গোপীবল্লভ সিংদেও... ৯
জীবন যন্ত্রণায় পাহাড়িয়া উপজাতি... চণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায় ... ১১
বিশেষ নিবন্ধ : প্রতিষ্ঠার অন্তরালে
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্মৃত প্রতিষ্ঠাতা...অভিজিৎ গুহ ...১২
বিশেষ নিবন্ধ : পশ্চিমবঙ্গের বাজেট
পশ্চিমবঙ্গের বাজেট ২০১৩-১৪ : বিশ্লেষণ ... সরজিৎ মজুমদার ... ১৫
বিশেষ নিবন্ধ : বাংলার চাষি
উনিশ শতকের বাংলার চাষি : এক অক্ষয় আর্কিটাইপ ... তরুণ বসু ...১৭
বিশেষ নিবন্ধ : জিন প্রযুক্তি
কৃষি সংকট ও জিন প্রযুক্তি... পুষ্প মিত্র ভার্গব ... ২১
বিশেষ নিবন্ধ : পোপ নির্বাচনের অন্তরালে
নতুন পোপ নির্বাচন : ধর্মতত্ত্ব না রাজনীতি?... সিদ্ধার্থ গুপ্ত... ২৬
বার্ষিক রচনাপঞ্জী মে ২০১২— এপ্রিল ২০১৩...৩০

ছবি ঋণস্বীকার : দুর্বার আর্কাইভ।
প্রচ্ছদ : তরুণ বসু

মুদ্রণ : রে'জ ডট কম, ৪৪/১, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

DURBAR BHABNA
New Declaration No 1/12 & 2/12 as on 2. 1. 2012
Vol. 4 No.12 □ April, 2013
Editor : Dr Smarajit Jana
Publisher : Bharati Dey
Address : 12/5 Nilmani Mitra Street, Kolkata 700 006 WB INDIA
Phone : 033 2543 7560/7451 Fax : 033 2543 7777 e mail : sonagachi @sify.com URL : www.durbar.org

সম্পাদকীয়

শাহবাগ ও ধর্মযুদ্ধ

সম্প্রতি শাহবাগের আন্দোলন বাংলাদেশকে বিশ্বের মানচিত্রে নতুন করে তুলে ধরেছে। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে জন্ম নিয়েছিল ১৯৭১ সালে অর্থাৎ আজ থেকে চার দশকেরও আগে। নতুন রাষ্ট্রের জন্মের পাশাপাশি বহু মানুষের মনে বয়ে এনেছিল এক মুক্তির আশ্বাস। ওই সময়ে এই উপমহাদেশের বিভিন্ন আর্থ-রাজনৈতিক টানাপোড়েন, বিশ্ব রাজনীতির দোলাচল ও ঘটনা প্রবাহ এরকম একটি প্রায় অসম্ভব ঘটনাকে সম্ভব করে তুলেছিল, জন্ম হয়েছিল নতুন দেশের। ১৯৪৭ সালে ধর্মভিত্তিক দেশবিভাজনের ইতিহাসেই লুকিয়ে ছিল অসন্তোষের বীজ, সেটাই কালক্রমে বাড়তে বাড়তে পূর্ব পাকিস্তান একসময় ফেটে পড়েছিল ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। এর পরপরই সারা পাকিস্তানে সংসদীয় ভোট অনুষ্ঠিত হয়। বিপুল ভোটে পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামি লিগ জিতলেও নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা অর্পণে পশ্চিম পাকিস্তানের গড়িমসি, যার পরিণতিতে পশ্চিমের সঙ্গে পুবের বিচ্ছেদ এবং বাংলাদেশের জন্ম। অবশ্য এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আরও অনেক আর্থ-রাজনৈতিক বিষয়। যেমন বৈষম্যমূলক শাসন ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক নির্ভরতা সহ রাষ্ট্রীয়স্তরের শোষণ ও নির্যাতন পশ্চিম পাকিস্তানের একদেশদর্শী নিয়মনীতি ইত্যাদি। সেই আলোচনায় আমরা ঢুকছি না। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী বিশেষত শাহবাগের আন্দোলন ঘুরে ফিরে পুরোনো একটি প্রশ্ন তুলে আনছে। মূলত সেই বিষয়টাতেই আমরা নজর রাখব। ধর্মভিত্তিক বিভাজনকে ভিত্তি করে ভারতকে ভেঙে তিন টুকরো করা হয়েছিল, প্রশ্ন হলো, সেই ভিত্তি মেনেই কি গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়? ধর্মভিত্তিক প্রজাতন্ত্র কি বাস্তবে সম্ভব? অধুনা রাষ্ট্রের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে তা কতটা সঙ্গতিপূর্ণ? ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোর মিল-অমিলের জায়গাটা কোথায়, সেই বিষয়টাই আমাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

বলা নিস্প্রয়োজন আজও এ পৃথিবীতে ধর্মের প্রভাব মানুষের মনের ও হৃদয়ের গভীরে গেঁথে রয়েছে। ধর্মভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলির সামাজিক এমনকি রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে কি ধরণের ক্ষমতার অধিকারী ও কিভাবে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি রাষ্ট্রপরিচালনার চৌহদ্দিতে সদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখে তা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। ১৯৭১ সালে নতুন রাষ্ট্রের জন্ম অনেক মানুষজনের মধ্যে (ওই দেশে ও বিদেশে) প্রচণ্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনার জন্ম দিয়েছিল। অনেকে এই নতুন রাষ্ট্রের জন্মের মধ্যে নতুন সম্ভাবনার ছবি খুঁজে পেয়েছিলেন। তবে পাশাপাশি এও ঠিক বাংলাদেশের বেশ কিছু মানুষ এ বিষয়টা সহজে মেনে নিতে পারেননি, তারা তাদের বিশ্বাসের জায়গা থেকে এই নতুন দেশের জন্মকে ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে এক অভিযান হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। তাদের মধ্যে

অনেকেই সেদিন তীব্র আক্রোশে নতুন রাষ্ট্রের জন্মের সমস্ত সম্ভাবনাকে খারিজ করতে শুধু সরবই ছিলেন না, সে দেশের এবং আরও বহু ইসলামিক দেশের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে শক্তি সংগ্রহ করে স্বাধীনতাকামী মানুষজনের বিরুদ্ধে আক্রমণ শাণিত করেছে এবং প্রয়োজনে নির্মম ও বর্বরোচিত আচরণের মাধ্যমে শয়ে শয়ে মানুষকে সেদিন তারা হত্যা করতে পিছ্‌পা হয় নি। সেই পুরোনো বিষয় ঘিরেই আজ আবার নতুন করে বাংলাদেশের জনমানসে তীব্র প্রতিক্রিয়া তথা সংঘর্ষের জন্ম দিচ্ছে, উথাল-পাথাল হচ্ছে মাতৃভূমি, অশান্তি আর বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে দেশের মানুষজনেরা। যে কোনো দেশেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোয় অপরাধীর বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা বলবৎ রয়েছে। আর এ ধরণের ক্ষেত্রে এক সর্বজনীন সাধারণ নিয়মনীতি অনুযায়ী পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই বিচার তথা শাস্তির বিধিব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এ নিয়ে বিশাল কিছু বিতর্ক বা নতুন কোনো ধরণের সংঘর্ষ দেশের মধ্যে সচরাচর ঘটতে দেখা যায় না। কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনা বিশেষত বাংলাদেশে মৌলবাদীরা এটিকে যে মাত্রায় তুলে এনেছে তাতে চিন্তার বিষয় রয়েছে। একে স্রেফ ধর্মীয় উন্মাদনা কিংবা 'মৌলবাদী'দের গুণ্ডামি আখ্যা দিয়ে পার পাওয়া যাবে না। সহজ ভাবে ধরে নেওয়া ঠিক হবে না যে এসবই ছোট্ট একটি মৌলবাদী গোষ্ঠীর আস্ফালন মাত্র, বিশেষ করে যখন সে দেশের প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং তাদের আঠারো দলের জোট ওই মৌলবাদীদের পক্ষে দাঁড়িয়ে ময়দানে কুস্তি ভাঁজছেন। শুধু তাই নয়, খুব সম্প্রতি কলকাতা শহরে একগুচ্ছ ধর্মভিত্তিক দল ও প্রতিষ্ঠান ওই সব বাংলাদেশী যুদ্ধপরাধীদের (যাদেরকে 'রাজাকার' হিসেবে চিহ্নিত করা হয় সেদেশে) সপক্ষে সওয়াল করতে ময়দানে নেমে পড়েছে, মিছিল, মিটিং-এ সোচ্চার হচ্ছে! বিষয়টার গুরুত্ব এখানেই। সাধারণ বুদ্ধি বিবেচনায় আমরা ধরে নিই খুনি, অত্যাচারী, যুদ্ধপরাধীদের শাস্তি দেওয়া একটি স্বাভাবিক বিষয় এবং পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই তা চাইবেন। কিন্তু বিষয়টা অত সরল নয়। এটা যেমন আমাদের অনেকের ধারণা অন্যদিকে 'ধর্মান্ধরা' মনে মনে বিশ্বাস করেন রাজাকাররা ওই সময় ধর্মের সপক্ষে এবং 'বিধর্মীদের' বিরুদ্ধে (যারা স্বাধীনতা চেয়েছিল) দাঁড়িয়ে যথার্থ ধার্মিক মানুষ হিসেবে তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। তাদের ওই 'ধর্মযুদ্ধে'র মধ্যে কিছু বাড়াবাড়ি থাকতে পারে, তবে সামগ্রিক ভাবে ওই 'ধর্মপ্রাণ' মানুষজনদের আচার-আচরণ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এবং প্রচলিত ধর্মীয় আচার-বিচার ও সংস্কৃতিতে কোনো গর্হিত কাজ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। বরং অনেকের ধারণায় সে সময় রাজাকাররা নিজেদের মতো করে ইসলাম ধর্ম রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। অনেকে হয়তো প্রশ্ন তুলবেন যে এই ধরণের বিশ্বাস বা ধারণা মুষ্টিমেয় কিছু মানুষজনের মধ্যে থাকলেও থাকতে পারে, বিষয়টা সাধারণ মানুষজনের ক্ষেত্রে ভিন্ন। আদপে ঘটনা কিন্তু সে কথা বলে না বরং দেশ-বিদেশের সীমারেখা ছাড়িয়ে বেশ বড়ো একটা জনগোষ্ঠীর মধ্যেই এ ধারণা যে বিদ্যমান সাম্প্রতিক ঘটনাবলী তার সাক্ষী। বাংলাদেশ, ভারত সহ অন্যান্য বহুদেশের ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ধর্মীয় আবেগতাড়িত এই ধারণা যে যথেষ্ট শক্তিশালী তা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। এই বিশ্বাসের যোগসূত্র হলো ধর্ম ও ধর্মবিশ্বাস। যদিও শাহবাগের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রেমী মানুষ-জনদের জোরালো বক্তব্যে বার বার উঠে এসেছে এবং তারা নির্দ্বিধায় বোঝাতে চেয়েছেন যে তারা ধর্মের বিরুদ্ধে নয়, তারা স্বাধীনতা-সাম্যের পক্ষে, তারা গণতন্ত্র তথা প্রজাতন্ত্রের নীতিমালায় বিশ্বাসী। তাই তারা অপরাধীর শাস্তি চাইছেন। তাদের বক্তব্য খুনি ও ধর্ষণকামী মানুষদের শাস্তি হওয়া উচিত তারা যে ধর্মাবলম্বী হোক না কেন, তাতে কিন্তু অপরপক্ষের চিন্তাভাবনায় একচুলও পরিবর্তন ঘটেছে বলে মনে হয় না।

অনেকেই হয়তো বলবেন এইসব মৌলবাদীরা ধর্মটাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে যুদ্ধপরাধীদের রক্ষা করার প্রয়াস নিচ্ছেন। এই যুক্তিটাকে মেনে নিয়েও বলতে হয় যে এই ব্যবহারের কারণ, ধর্ম ঢাল ভীষণ কার্যকর একটি অস্ত্র। আর এই ঢালের কার্যকারিতা গুটিকয় মানুষের বিশ্বাসকে নির্ভর করে গড়ে ওঠে নি, বিষয়টা শুধু তথাকথিত মৌলবাদী, তালিবানি, ধর্মান্ধ মানুষদের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে তাদেরকে ঘিরে যে সব মানুষজন রয়েছেন তাদের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ সমর্থনের জায়গা থেকে। আমাদের সমাজে ছড়িয়ে রয়েছে এমন অসংখ্য কমবেশি ধর্মবিশ্বাসী মানুষজন— মৌলবাদী বা তালিবানীদের সাফল্য ও শক্তি নিহিত রয়েছে সেই মানুষদের নৈতিক সমর্থন নিজেদের সপক্ষে টেনে আনার জায়গা থেকে। যদি পৃথিবীর সব মানুষদের একটি বৃত্তের মতো করে সাজিয়ে ফেলা যায়, অনেকটা অণুর বা অ্যাটমের গঠনের মতো যার কেন্দ্রে রয়েছে নিউক্লিয়াস আর তার চারদিকে কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন দূরত্বে আবর্তন করছে ইলেকট্রন। সেরকম ভাবে দেখলে এক্ষেত্রে ওই বৃত্তের কেন্দ্রে রয়েছেন ধর্মীয় মৌলবাদীরা। কেন্দ্রের কাছাকাছি বৃত্তের মানুষজন দ্রুত আকৃষ্ঠ হবেন সেদিকে এবং তারাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন জোগান মৌলবাদীদের। আবার যারা ওই কেন্দ্র থেকে যত দূরে রয়েছেন তাদের কেন্দ্রের প্রতি আকর্ষণ তত কম এবং কেন্দ্র থেকে দূরতম বিন্দুতে যে মানুষজনরা অবস্থান করছেন কেন্দ্রের প্রতি তাদের আকর্ষণ অপেক্ষা বিকর্ষণই বেশি অনুভূত হবে। তাদের অনুভবে ও চেতনায় ধর্ম নিরপেক্ষতা, সমানুভবতা, স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিকতার প্রভাব থাকবে বেশি। তবে ধরে নেওয়া যেতে পারে এই সংখ্যাটা বিশাল আকারের নয়। এই সহজ সরল সত্যটা আমরা অনায়াসে ভুলে যাই, কিংবা জেনেশুনেও বিশ্বাস করতে মন চায় না।

এই কিছুদিন আগেও আরব ভূখণ্ড জুড়ে 'বসন্তের বাতাস' বয়ে গেল— গণতন্ত্রপ্রেমী, স্বাধীনতাকামী মানুষজনদের আবেগ আর উৎসাহকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এক জনজাগরণ। সেই উত্তাল আবহাওয়াকে সওয়ার করে শেষ পর্যন্ত মিশরের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ফিরে এল যে রাজনৈতিক দল, তাদের বিশ্বাস ও মূল্যবোধ ধর্মভিত্তিক। তারা ক্ষমতায় আসার পরক্ষণেই গণতন্ত্রের টুঁটি টিপে ধরতে কসুর করল না। এরকম ঘটনা ইতিহাসে আগেও বহুবার ঘটেছে, এবারেও তার বিশেষ কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না। গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষরা আরও একবার প্রতারিত হলেন। ঠিক একই ঘটনা ঘটেছিল কয়েকদশক আগে ইরানে। ইরানের রাজতন্ত্র জনরোষে ভেঙে পড়লে সে আসন শেষ পর্যন্ত দখল করল আর এক রাজনৈতিক দল যাদের ভিত্তি ধর্ম এবং প্রকারান্তরে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হলো ধর্মবাদী একনায়কতন্ত্র। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে শাহবাগ আন্দোলন কি বার্তা বয়ে আনছে তা আগামীদিনের ইতিহাসই বলতে পারে।

সন্দেহ নেই, এখনও আমাদের সমাজে সম্ভবত সব থেকে স্পর্শকাতর বিষয় হলো 'ধর্ম'। এ ব্যাপারে জ্ঞানীগুণিজনেরা তো বটেই, রাজনৈতিক নেতা নেতৃবৃন্দ, এমনকি বামপন্থী মানুষজনেরাও পারলে ধর্ম বিষয়ক বিতর্ক, আলোচনা এড়িয়ে কিংবা পাশ কাটিয়ে নিস্তার পাওয়ার চেষ্টা করেন। অন্যদিকে ধর্মের পরিব্যপ্তি এতটাই যে বহু চেষ্টা করেও তার থেকে ছাড় পাওয়া বেশ কষ্টসাধ্য

ব্যাপার। বিশেষত পরিবারে নিজের জনগোষ্ঠীতে, সমাজে বহুধরণের কর্মকাণ্ডে ধর্মীয় বিষয়বস্তু নীতিমালা ও বিধিব্যবস্থা এমন ভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে যে ইচ্ছে করলেও, মন না চাইলেও এই ধর্মের প্রতি আমাদের যুগ যুগ ধরে গড়ে তোলা এক নিবিড় নির্ভরতা ও 'মোহমুগ্ধতা' কাটিয়ে ওঠা যায় না। তাই ধর্ম না মেনেও ধর্মের বেড়াজালে আটকে পড়ে আছি অনেকেই। কিন্তু ধর্মীয় মূল্যবোধ, নীতিমালা ও বিধিব্যবস্থা আর রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে গড়ে ওঠা প্রজাতন্ত্রের ধ্যান-ধারণা এক বস্তু নয়। ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যাবে ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই করে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির বিকাশ তথা প্রসার ঘটেছিল এবং বিষয়টা শুধুমাত্র জড় বিজ্ঞান কিংবা প্রযুক্তির বিষয়েই সীমাবদ্ধ নয়, সমাজ বিজ্ঞানের ধ্যানধারণায় সেদিনের বিজ্ঞানমনস্কতা এক নতুন মাত্রা এনেছিল। রাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে পৃথিবীর মানুষ সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের মূল্যবোধ দিয়ে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিল এক উন্নততর সমাজ আর সেই রাস্তা ধরেই সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্ম ঘটেছে পৃথিবীতে। রাজতন্ত্র, পরিবারতন্ত্র ছাড়িয়ে গণতন্ত্রের বিকাশের প্রেক্ষিতে সমস্ত ব্যক্তি-মানুষের সমান মর্যাদা ও অধিকার থেকে শুরু করে ন্যায়নীতি ও অন্যান্য মূল্যবোধের যে ব্যাপ্তি ও প্রসার, আধুনিক সমাজে তার সঙ্গে দু'হাজার বছরের পুরোনো ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসে তা খুঁজে পাওয়া যাবে না, পাওয়া সম্ভব নয়। যে ঐতিহাসিক কারণে এই সব উন্নততর মূল্যবোধ ও ধ্যান-ধারণার তথা ন্যায়নীতি ও প্রক্রিয়া প্রকরণের উদ্ভব ঘটেছে বিগত দু-তিনশো বছরে তা ধর্মের চৌহদ্দিতে গড়ে ওঠা সম্ভবপর ছিল না।

দু-আড়াই হাজার বছর পূর্বের সমাজকে সূত্রায়িত করতে, সেই সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যে সামাজিক বিধিব্যবস্থা ও নিয়মনীতির তথা পরিচালনা পদ্ধতির প্রয়োজন ছিল সে জায়গাটা ধর্ম সেদিন পূরণ করেছিল সন্দেহ নেই। ধর্মের উদ্ভাবনার ইতিহাস সে কথাই বলে। সে সময়ে ব্যক্তি স্বাধীনতার থেকে 'গোষ্ঠীর নিরাপত্তা', সর্বজনের মতামতের গুরুত্ব অপেক্ষা কোনো এক ব্যক্তির ধারণা ও বিশ্বাসকে মতবাদ হিসেবে খাড়া করা তথা তার সেই আধিপত্যকে কায়েম করার মাধ্যমে আশেপাশের মানুষজনকে গোষ্ঠীবদ্ধ করার প্রক্রিয়া গুরুত্ব পেয়েছিল। ধর্মের চৌহদ্দিতে তাই বিচার বিশ্লেষণ, তথ্য আহরণ তথা অনুসন্ধানের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। ধর্ম বৈজ্ঞানিক যুক্তি বা প্রমাণের ধার ধারে না, ধর্ম দাবি করে তার প্রতি প্রশ্নহীন নির্ভরতা, ধর্মের নিয়মনীতির কাছে মানুষের চূড়ান্ত আত্মসর্মাপণ। ধর্মীয় আপ্তবাক্যই সত্য বলে মেনে নিতে হবে, কোনো প্রশ্ন করা চলবে না। এই ছিল ধর্মীয় গোষ্ঠীতন্ত্র পরিচালিত সমাজব্যবস্থার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। সব মানুষের সমান গুরুত্ব কিংবা সবার সমান অধিকারের কথা ধর্মে স্বীকৃত নয়। নারী-পুরুষের সমান অধিকারের তো প্রশ্নই ওঠে না। এসব উন্নততর মূল্যবোধ ও ধ্যান-ধারণা অধুনার গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ফসল।

একটু সাদাচোখে ধর্মের উৎপত্তি তথা এইসব ধর্মের বিস্তারের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, ধর্মের 'জিনেই' রয়েছে মৌলবাদ। ধর্মকে 'মৌলবাদ' কখনই বাইরের থেকে আমদানি করতে হয় না। এই মৌলবাদী জিনের বহিঃপ্রকাশ কোথায় কিভাবে কোন্ সময়ে ঘটবে তা নির্ভর করে পরিবেশের উপর। সামজিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন কার্যকারণকে নির্ভর করে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে এই ধর্মীয় মৌলবাদ বিকশিত হয়। আমরা কখনও বা তাকে তালিবান বলি, কখনও বা ডাকা হয় অন্য কোনো নামে। কিন্তু এটা ভুললে চলবে না যে মৌলবাদের বীজ সুপ্ত রয়েছে ধর্মে, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ধর্মীয় রীতিনীতি তথা তার প্রয়োগ ও তার পরিচালন পদ্ধতিতে। একথা শুনে অনেকেই অবশ্য হাঁ হাঁ করে উঠবেন। তারা বলবেন যে, ধর্মপুস্তকে অনেক ভালো ভালো কথা লেখা রয়েছে। ভালো কথা যে লেখা নেই, তা কেউ বলবে না। কিন্তু গত আড়াই হাজার বছরের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের হিসেব-নিকেশ করলে (প্রথম কয়েকশো বছর বাদ দিয়ে) এই সব বক্তব্যের ফাঁকিটা ধরা পড়ে যাবে। গত দেড়-দু'হাজার বছর জুড়ে ধর্ম কিভাবে মৌলবাদী ধ্যান-ধারণাকে পরিপুষ্ট করেছে এবং প্রয়োগ করেছে, জনসাধারণের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করেছে, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মর্যাদা হরণ করেছে এবং তাতে সমাজের কিভাবে ভালোমন্দ হয়েছে তার বিশ্লেষণ তথা খতিয়ান অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য তথ্য তুলে আনবে। তাই শুধু ধর্মপুস্তকে কি লেখা রয়েছে এবং সেই সব বাক্যের ভাবসম্প্রসারণ করে ধর্মকে বোঝা যাবে না। সেদিক থেকে বিচার করলে ধর্মপ্রাণ, পরধর্ম-বিদ্বেষী, ধর্মান্ধতা, মৌলবাদী ইত্যাদি এই সব বিভিন্ন শব্দের ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের সমাজে মানুষের চরিত্র তথা ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য বোঝানো হয়। কার্যত এই শব্দগুলির মধ্যেকার ব্যবধান কিন্তু অত্যন্ত সুক্ষ্ম, আজ যে ধর্মভীরু কাল সে তালিবান চরিত্র নিতে পারে, পরশু সে পরধর্ম বিদ্বেষীর ভূমিকা নিয়ে মানুষ খুন করতে পিছ্পা হয় না। আসলে 'মৌলবাদী জিন'-এর প্রকাশ নির্ভর করে সমসাময়িক পরিস্থিতির ওপর, সামাজিক ঘটনাবলী এবং বিশেষ সময় ও কালের প্রভাবে যা সাধারণ ভাবে প্রায় সব ধর্মপ্রাণ মানুষেরাই বহন করেন।

মোদ্দা কথা হলো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, ধ্যান ধারণা ও রীতিনীতি কখনই ধর্মীয় নীতিমালার সঙ্গে খাপ খায় না। তাই ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল ও তাদের ভূমিকা কখনই গণতন্ত্রের সমার্থক হতে পারে না। সেই অর্থে খ্রিস্টান ডেমোক্রাট, বিজেপি (যারা হিন্দুত্ব ও রাম রাজত্বের কথা বলে) কিংবা ইসলামিক ব্রাদারহুড সবই 'হাঁসজারু'। যতই ঢাকঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করা হোক না কেন ইসলামিক কিংবা হিন্দু প্রজাতন্ত্রের কথা, এসবই আসলে সোনার পাথরবাটি। হিন্দু রাজতন্ত্র হয়, ইসলামিক সুলতান বা সম্রাট রাজ্য পরিচালনায় আসতে পারে। কিন্তু প্রজাতন্ত্রী ইসলামিক রাষ্ট্র হয় না, হওয়া সম্ভব নয়। ধর্মের প্রতি আমাদের এই প্রাগৈতিহাসিক মোহ যতদিন বিদ্যমান রয়েছে, ততদিন গণতন্ত্রের বিস্তার ও বিকাশ নানান ভাবে বাধা পেতে বাধ্য। বহু রক্তক্ষয়ের মাধ্যমে স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের উপর ভিত্তি করে যে সমাজ গড়ার স্বপ্ন তৈরি হয়েছিল, আজ যে প্রজাতন্ত্রের কথা বলা হয় পৃথিবীতে, তার বয়স বড়জোর আড়াইশো বছর মাত্র। অর্থাৎ সেই অর্থে আমাদের এই সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় গণতন্ত্রের প্রসার এবং প্রয়োগের শৈশবকাল চলছে। আর আমরা সবাই জানি শৈশবকালে শিশুরা ভোগে নানান অসুখে-বিসুখে। প্রজাতন্ত্রের বড়ো হওয়া আর বেড়ে চলার রাস্তায় নানান ধরণের বাধা-বিপত্তির মুখোমুখি হওয়া তাই খুব স্বাভাবিক ঘটনা। বাংলাদেশে গণতন্ত্রপ্রেমীদের উপর মৌলবাদীদের এই আক্রমণ তাই নতুন কোনো উপসর্গ নয়। এসব লড়াইয়ে সাময়িক জয়-পরাজয় কাটিয়ে মানব সভ্যতা এমনি ভাবেই এগিয়ে যায় এবং এগিয়ে যাবে আগামী প্রজন্মের হাত ধরে।

শাহবাগের আন্দোলন সেই সম্ভাবনারই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

স্মরজিৎ জানা

শাহবাগ ও নবীন প্রজন্ম

বিপ্লব মাজী

আরব বসন্ত, ওয়ালস্ট্রিট বিক্ষোভ, গ্রিস, স্পেন, ইতালির এথেন্স, মাদ্রিদ, রোমের বিক্ষোভ, দিল্লির ইন্ডিয়া গেট বিক্ষোভ, তারপর এই শাহবাগ বিক্ষোভ....পৃথিবী জুড়ে যে অস্থিরতা, নিরাপত্তা-হীনতা, অর্থনৈতিক বিপর্যয় তারই ফল দেশে দেশে হতাশ, দিশাহীন নবীন প্রজন্মের বিক্ষোভ। প্রতিটি বিক্ষোভের চরিত্র আলাদা। কিন্তু প্রতিটি বিক্ষোভে পৃথিবী জুড়ে যে অন্যায়, অত্যাচার, দুর্নীতি ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চলছে তার বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রবল ঘৃণা উগরে দিচ্ছে! ...সর্বত্রই মানুষ হাতে অস্ত্র তুলে না নিয়ে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন। যাদের বিরুদ্ধে তারা কিন্তু আগ্রাসী, হিংসা ও সন্ত্রাস ছড়িয়ে বিক্ষোভের আগুন নেভাতে চাইছে।

এই ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম ট্রাইবুনাল (ICT) মৌলবাদী আব্দুল কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে আনা ছটি অপরাধের পাঁচটিতে তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল। এই রায়ের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের নতুন প্রজন্ম বিদ্রোহে ফেটে পড়ল! কেন? কে এই মোল্লা? আব্দুল কাদের মোল্লা, বাংলাদেশের জামাত-ই-ইসলামির সহকারী সাধারণ সম্পাদক। তার অপরাধ? ১৯৬৯ থেকে বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও রাজাকারদের সাহায্য করা। এই মোল্লাকে বলা হয় মিরপুরের কসাই। কারণ, ঢাকার মিরপুর এলাকা জুড়ে মোল্লা গণহত্যার তাণ্ডব চালিয়েছিল। নিজে হাতে প্রকাশ্য দিবালোকে একজন কবির শিরোচ্ছেদ করেছিল! ১১ বছরের বালিকাকে ধর্ষণ করেছিল! ৩৪৪ জন মানুষকে হত্যা করেছিল। এই আক্রমণ চলেছিল বেছে বেছে বাংলাদেশের বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের সংখ্যালঘু মানুষদের উপর! এত বড়ো অপরাধীর এত অপরাধের শাস্তি ট্রাইবুনালের বিচারে শুধুই যাবজ্জীবন! গুরু অপরাধে এই লঘু দণ্ডের বিরুদ্ধেই বাংলাদেশের তরুণ-প্রজন্মের বিস্ফোরণ! স্ফুলিঙ্গ থেকে অগ্নিশিখা! শাহবাগ প্রজন্ম-চত্বরে রূপান্তরিত। শাহবাগ প্রতিবাদীরা মনে করেন, গণহত্যাকারী মোল্লার প্রতি এই বিচার ন্যায়সঙ্গত নয়, আসলে হওয়া উচিত তার ফাঁসি। জীবিত সমস্ত রাজাকার আর যুদ্ধ অপরাধীদেরই ফাঁসি হওয়া উচিত। তরুণ প্রজন্মের এই স্বতঃস্ফূর্ত দাবি ও বিক্ষোভ ইন্টারনেট ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব, ইত্যাদি নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে। শাহবাগ স্কোয়ারে লক্ষ লক্ষ মানুষের জমায়েত। প্রতিবাদ, স্লোগান। পোস্টারে-ফেস্টুনে-প্লাকার্ডে। তারা দেশপ্রেমের গান গাইছে, কবিতা পড়ছে, আবৃত্তি করছে, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পাঠ করছে। চাইছে সমস্ত দেশদ্রোহী ও মৌলবাদীদের ফাঁসি। বলছে ইসলাম কখনই খুন, গণহত্যা, দেশদ্রোহ সমর্থন করে না। গণহত্যাকারীদের কোনো ধর্মীয় পরিচয় নেই। তাদের একমাত্র পরিচয় তারা খুনি! প্রজন্ম চত্বরে যাঁরা ভিড় করছেন তাঁদের বেশির ভাগেরই তথাকথিত ধর্মীয় পরিচয় তারা মুসলিম।

অন্যদিকে বিদেশী অর্থপুষ্ট জামাত-ই-ইসলামি বসে নেই। আব্দুল কাদের মোল্লার যাবজ্জীবনের বিরুদ্ধে তারা হিংস্র হয়ে উঠেছে! সশস্ত্র শোভাযাত্রা ও মিছিল বের করেছে সংগঠিত জঙ্গি-গোষ্ঠী। বাংলাদেশ সরকারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ তৈরির চেষ্টা করেছে। তারা তুরস্কের সমর্থনও পাচ্ছে। কিন্তু পাকিস্তানসহ অন্যান্য মুসলিম দেশ মোল্লার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহী নয়। কেননা, মোল্লা দ্বিজাতি তত্ত্বে বিশ্বাস করে। সে পাকিস্তানি সেনার পাশাপাশি ধর্মীয় মৌলবাদী দল রাজাকার, আলবদর, আলশামস্‌দের নিয়ে ইসলামি বাংলাদেশ চেয়েছিল। বেছে বেছে হিন্দুদের হত্যা করেছিল ও ঘরবাড়ি পুড়িয়েছিল। বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে জামাত-ই-ইসলামির প্রভাব আছে। তার ওপর বাংলাদেশের বিরোধী দল বিএনপি জামাতের ধর্মঘট ও হরতালকে সমর্থন জুগিয়ে মৌলবাদীদের উৎসাহ জুগিয়েছে। ফলে জামাত-ই-ইসলামিকে নিষিদ্ধ করার আগে বাংলাদেশের হাসিনা সরকারকে দশবার ভাবতে হচ্ছে।

> □□ পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপে গণতন্ত্র ও বহুস্বরের ছবি চোখে পড়ে না। বাংলাদেশের শাহবাগ চত্বরে ... লক্ষ লক্ষ যৌবন পথে নেমেছে ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের লক্ষ্যে ... মুক্তিযুদ্ধে যারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হয়ে নিজের দেশের মানুষদের খুন করেছিল, বিচারের নামে তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের বিরুদ্ধে নবীন-প্রজন্ম।

আজ আমাদের চারপাশে পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপে গণতন্ত্র ও বহুস্বরের ছবি চোখে পড়ে না। বাংলাদেশের শাহবাগ চত্বরে লক্ষ লক্ষ যৌবন পথে নেমেছে ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের লক্ষ্যে মৌলবাদ ও তালিবানি-শক্তির বিরুদ্ধে। ওদেশের মুক্তিযুদ্ধে যারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হয়ে নিজের দেশের মানুষদের খুন করেছিল, বিচারের নামে তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের বিরুদ্ধে নবীন-প্রজন্ম। ওদেশের শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, বুদ্ধিজীবীরাও তাই এই আন্দোলনে ভিড় করেছেন।

কিন্তু, পৃথিবীর সব দেশেই ক্ষমতার অলিন্দে এমন সব ঘটনা ঘটে, যার সঙ্গে সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা মেলে না। ভারতের বুকেও নানা ঘটনা দেখা যাচ্ছে— যারা অপরাধী, যাদের জেলে থাকা উচিত, তারা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর নিরপরাধ মানুষ বিনা বিচারে জেলে পচছে। শাহবাগের কাছ থেকে তাই আমাদেরও অনেক কিছু বোঝার আছে। □

শাহবাগ আন্দোলনের প্রেক্ষিত, ভবিষ্যৎ ও বামপন্থীদের ভূমিকা

চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য

'বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলোর আপসকামী ও সুবিধাবাদী মনোভাবের উপর আস্থা রাখতে না পেরে জনগণ আজ নিজেই রাস্তায় নেমে এসেছে এবং প্রমাণ করেছে শহিদ জননী জাহানারা ইমামের শেষ চিঠির সেই বিখ্যাত উক্তিটি ''জনগণের চেয়ে বিশ্বস্ত আর কেউ নেই।'' বর্তমান প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক দলগুলিকে নিজেদের অভিযোজিত করতে হবে জনগণের আকাঙ্ক্ষার সাথে নতুবা অবশ্যম্ভাবী ভাবে তাদের নিক্ষিপ্ত হতে হবে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে। এই ঐতিহাসিক ক্ষণে দাঁড়িয়ে, ছাত্র ইউনিয়ন সকল চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীর ফাঁসি নিশ্চিত করা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের লড়াইয়ে গোটা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিচ্ছে। এ ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে ছাত্র ইউনিয়নের দাবি : ১. সকল যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসি নিশ্চিত কর; ২. জামাত-শিবিরসহ সকল মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার নিষিদ্ধ কর; ৩. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র কায়েম কর; এবং ৪. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে একই ধারার গণমুখী, বিজ্ঞানভিত্তিক, সর্বজনীন শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন কর।'

মার্চে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের (বাছাই) প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে একথা বলা হয়েছে। শাহবাগের চত্বরে পাঁচ ফেব্রুয়ারি থেকে টানা যে ছাত্র-যুবদের গণজাগরণ শুরু হয়েছে, বাছাই তার শরিক। বাছাই-নেত্রী লাকি আখতারকে মানুষ 'শাহবাগের কোকিলকণ্ঠী', 'শ্লোগান লাকি' নাম দিয়েছেন। এ-ছাড়াও এই আন্দোলনে আছেন বাংলাদেশের বামপন্থী আন্দোলনের জোটের ছাত্র ও যুবকেরা। আন্দোলনের সমর্থনে শাহবাগ চত্বরে সমবেত হয়ে বিশ্ব নারী দিবস পালনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন বামপন্থী দলগুলির মহিলা শাখাগুলি। এই আন্দোলনকে, শুরুতে যা ছিল ঢাকার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবকদের, ধারে ধীরে তা বাংলাদেশের সব প্রজন্মকেই টানছে, ছড়িয়েও পড়ছে দেশের নানা প্রান্তে। এবং এই ছড়িয়ে পড়াটাও যান্ত্রিক ভাবে নয়, আন্তরিক ভাবে। যেমন, ঢাকা থেকে হিলাল ফ্যায়েজির পাঠানো রিপোর্টে প্রকাশ, নারায়ণগঞ্জের একটি গরিব গ্রামের মানুষেরা নিজেরাই গ্রাম থেকে চার মণ চাল সংগ্রহ করে, ২৪ ঘণ্টার পরিশ্রমে সেই চাল গুঁড়ো করে, খেজুর গুড় বানিয়ে, তাই দিয়ে পিঠে বানিয়ে শাহবাগে এনেছেন। এ-কাজে গোটা গ্রামের মানুষ স্বতস্ফূর্ত ভাবে অংশ নিয়েছেন। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের সময়ে ধর্মতলা বা পরে সিঙ্গুরের গণ-অবস্থান ছাড়া এ-দেশের কোনো গণ আন্দোলনে এমনটি হয়নি।

বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী ফরহাদ মজহারের একটি মন্তব্যই আসলে বামপন্থীদের প্রসঙ্গ অবতারণার কারণ। তিনি লিখেছেন, শাহবাগের আন্দোলন ঢাকার মধ্যবিত্ত শ্রেণির যুবকদের। এর পিছনে শ্রমিক বা কৃষকদের কোনো ভূমিকা বা অংশগ্রহণ নেই। বামপন্থী, বিশেষত কমিউনিস্টরা কোন্ শ্রেণির পক্ষে বা কোন্ শ্রেণির কথা বলে, তা মজহার সাহেবের অজানা নয়। এমনি এমনি বাংলাদেশের সব পেশার মানুষ এসে শাহবাগে সমর্থন জানাচ্ছেন না। যে সরকারের ব্যর্থতার থেকেই এই আন্দোলনের উৎপত্তি, তারাও কখনই এসে আন্দোলনে সামিল হতো না, যদি না দেশের সর্বাধিক অংশের মানুষ—অর্থাৎ শ্রমিক ও কৃষক— এই আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ভাবে যোগ না দিতেন।

এই আন্দোলনে বামপন্থীদের অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে এক ব্লগার ''শাহবাগ আন্দোলন : কার লাভ কার ক্ষতি'' শিরোনামে লিখেছেন, 'রাজাকারদের ফাঁসির দাবিতে শাহবাগ আন্দোলনের নেতৃত্ব মূলত প্রকাশ্যে সম্প্রতি জোটবদ্ধ হওয়া সিপিবি ও বাসদের ছাত্র সংগঠনের হাতে। আর আড়াল থেকে ওদের মদদ দিচ্ছে আওয়ামী লীগ।' আর, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বাংলাদেশের *সাপ্তাহিক* পত্রিকার সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে বলছেন, 'যখন কাদের মোল্লার ফাঁসির পরিবর্তে যাবজ্জীবন দেয়া হয় তখনই প্রগতিশীল সংগঠনগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জঙ্গি মিছিল বের করে প্রতিবাদ জানায়। ছাত্র ইউনিয়ন সন্ধ্যায় মশাল মিছিল বের করার সিদ্ধান্ত নেয়। ইতোমধ্যে আরও সংগঠন প্রতিবাদ জানিয়ে আন্দোলনের ঘোষণা দেয়। ব্লগারদের একটি অংশ এসে ব্যানার নিয়ে শাহবাগে অবস্থান নেয়। সন্ধ্যায় ছাত্র ইউনিয়নের মশাল মিছিলে প্রতিবাদী সংগঠনগুলো অংশ নেয়। মিছিলটি রূপসী বাংলা মোড় ঘুরে শাহবাগ মোড়ে এলে সবাই বসে যায়। পরে শাহবাগের সকল রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এরপরই শাহবাগ মোড়ে প্রতিবাদী মানুষের ঢল নামে। এই জাগরণে প্রথম থেকে থাকতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে

করছি।' কাজেই, তাহিরির স্কোয়ারের 'আরব স্প্রিং' বা সম্প্রতি দিল্লিতে শীতের ভ্রুকুটি অগ্রাহ্য করে ধর্ষণের বিরুদ্ধে ছাত্র-যুবদের গণ-অবস্থানের সঙ্গে শাহবাগের তুলনা হয় না। একমাত্র মিল--- 'ছাত্র-যুবদের গণ-অবস্থান'। তাহিরির স্কোয়ারের আন্দোলন ছিল বিদেশী মদতে সেখানকার সরকারকে উৎখাতের আন্দোলন, যা বাংলাদেশের গণজাগরণের উদ্দেশ্য নয়। বরং, আন্দোলন সফল হলে তার লাভ মূলত পেতে পারে ক্ষমতাসীন আওয়ামি লিগ, বাকিটা বামপন্থীরা। আর, দিল্লির অবস্থানের প্রেক্ষিত ও পরম্পরা আলাদা। সেটি ছিল হঠাৎ একটি ঘটনায় বহুদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ, কোনো চলমান আন্দোলনের ধারা নয়।

শাহবাগ আন্দোলনের পিছনে আছে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিকতা এবং ২০ বছর আগে শহিদ জননী জাহানারা ইমামের ডাকে শুরু 'একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল' করার গণআন্দোলনের প্রেক্ষিত। সেদিনও ঘটেছিল লক্ষ লক্ষ বাঙালির অংশগ্রহণ।

সিপিবি-র সভাপতি সেলিম স্পষ্টই বলেছেন, 'যুদ্ধাপরাধী বিষয়ে আওয়ামী লিগের প্রতি যেমন অবিশ্বাস রয়েছে তেমনি বিএনপির বিরুদ্ধে নতুন প্রজন্মের ক্রোধ প্রকাশ পাচ্ছে। এই অবিশ্বাস ও ক্রোধের কেন্দ্রবিন্দু কিন্তু জামায়াত-শিবির। বিষয়টি এইভাবে দেখতে হবে। ফাঁসি না হলে বিএনপি ওদের বের করে নিয়ে আসবে। আর ফাঁসির ব্যাপারে আওয়ামী লিগের ওপর ষোলআনা ভরসা করা যাচ্ছে না। তাহলে কি করণীয়? করণীয় হচ্ছে আমাদের ঘর থেকে বের হয়ে আসতে হবে। ইতোমধ্যে তরুণরা ঘর থেকে বেরও হয়েছে। আজ উত্তপ্ত জাগরণের মধ্য দিয়ে তরুণরা মনে করছে, আমরা কারও ওপর ভরসা করতে পারছি না।' মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিই এই আন্দোলনের প্রেক্ষিত রচনা করেছে।

প্রেক্ষিত বা পটভূমি

এই উপমহাদেশের দেশভাগের মধ্যেই নিহিত ছিল আজকের আন্দোলনের বীজ। ১৯৪৭-এ ভারত ভাগ হলো ধর্মের ভিত্তিতে। অথচ, ধর্ম কখনই কোনো জাতি গঠনের আধার না। পাশাপাশি অনেকগুলি মুসলিম বা খ্রিস্টান রাষ্ট্রের উপস্থিতিই তার প্রমাণ। অন্যদিকে, দেশ ভাগের পর ভারতের রাজ্যগুলি ভাগ হলো ভাষার ভিত্তিতে। বহুক্ষেত্রেই এই মানদণ্ডকেও ঠিক মতো মানা হয়নি (যেমন, মহারাষ্ট্র-গোয়া-গুজরাতবা মাদ্রাজ-অন্ধ্র- পুদুচেরি; যা পরবর্তীকালে বিষফোড়া হয়ে দেখা দিয়েছে, দিচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও দেবে। এই দৃষ্টিতেই দার্জিলিং সমস্যাকেও দেখা উচিত বলে মনে করি)। আবার, জাতিবাদকেও টিকিয়ে রেখে জনগণকে বিভক্ত করা হলো। 'জন' আর 'গণ'-এর মিলন হলো না। ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হওয়া দেশে ভাষার ভিত্তিতে বিভক্ত রাজ্যের জাতপাতের ভিত্তিতে বিভাজিত জনতা পেল এক অ-বাক গণতন্ত্র। সেখানে রইল কেবল ভোটদানের গণতন্ত্র। জাতিসত্তা নয়, 'ভোটার' থেকে গেলেন। এই বাংলায় কোনোদিনই তাই বাঙালি জাতি তার আত্মপরিচয় খুঁজে পায়নি।

কিন্তু, এক ভাষার দেশ বলেই পূর্ব পাকিস্তান বা অধুনা বাংলাদেশের সমস্যা ছিল কম। ফলে, স্বাধীনতা পরবর্তী পাকিস্তান সরকারের ভুল সিদ্ধান্তে দেশভাগের পর পরই পূর্ব বাংলার মানুষ অযাচিত ভাবে প্রকৃত জাতিসত্তার সন্ধান পেলেন ভাষার আন্দোলনে। ১৯৫২-র মাতৃভাষার সেই আন্দোলনই বাঙালিকে ধর্ম ও জাতপাতের ঊর্ধ্বে তুলে জন্ম দিল এক জাতিসত্তার। এই পরিচয়ই পূর্ব বাংলায় ১৯৬২ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনের অধিকার আদায়ে বাঙালিকে পথে নামিয়ে ইসলামাবাদের সরকারকে বাধ্য করেছে নতি স্বীকারে। ১৯৫২-র সংগ্রামই রচনা করেছে ১৯৭১-এর মুক্তি সংগ্রামের পটভূমি, ত্রিশ লক্ষ বাঙালির প্রাণের বিনিময়ে। ১৯৭১-এ মুক্ত পূর্ববাংলা হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ।

গণহত্যা, গণধর্ষণ, লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে মুক্তি সংগ্রামকে দমন করতে পাক বাহিনী সহযোগী হিসাবে তৈরি করেছিল 'রাজাকার', 'আল-বদর', 'আল-শামস' বাহিনী। এরা ও এদের মদতে পাক বাহিনী ত্রিশ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা করা ছাড়াও দু'লক্ষ নারীর ইজ্জত লুটেছে, বুদ্ধিজীবীদের গণহত্যা করেছে। তাই, স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মলগ্নেই নিষিদ্ধ হয়েছিল রাজাকারদের রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামি। মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলছেন, '১৯৭১ সালের ১৭ ডিসেম্বর গোলাম আযমরা যদি তোপখানার এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেত তাহলে জনগণ টুকরো টুকরো করে ফেলত। ১৬ ডিসেম্বর নিয়াজী যখন আত্মসমর্পণ করে সেখানে পরিষ্কারভাবে লেখা ছিল যে, আমার সকল জোয়ান এবং আমাদের সহযোগী সকল বাহিনী আত্মসমর্পণ করলাম। পাকিস্তান সেনাদের অস্ত্র ঠিকই সমর্পণ করেছিল। কিন্তু রাজাকার, আল-বদর, আল-শামসদের কোনো অস্ত্র সমর্পণে বাধ্য করাতে পারিনি। তারা সেই বে-আইনি অস্ত্র নিয়ে আত্মগোপনে চলে গেছে। কিন্তু দলিলে যখন লেখা আছে পাকিস্তানি বাহিনীসহ তাদের সকল সহযোগী সংগঠন আত্মসমর্পণ করেছে, সুতরাং জামায়াতে ইসলামীও আত্মসমর্পণ করার মধ্যেই পড়ে। এ কারণে তারা স্বাধীনতার পরপরই নিষিদ্ধ থাকে। ব্যাপারটা এমন যে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যদি বাংলাদেশের মাটিতে ক্যাম্প স্থাপন করার অধিকার হারিয়ে ফেলে তাহলে জামায়াতও রাজনীতি করায় সম্পূর্ণ অধিকার হারিয়েছে।'

সেই বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়েছিল ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়নের মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৮ নং অনুচ্ছেদে বলা আছে, 'সকল নাগরিক রাজনৈতিক দল গঠন করতে পারবে, তবে ধর্মের নামে, ধর্মকে ব্যবহার করে কেউ রাজনীতি করতে পারবে না।' সুতরাং জামায়াত আইনের মাধ্যমেই নিষিদ্ধ দল। কিন্তু তাকেই মান্যতা দিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের বিশ্বাসঘাতক লেঃ জেনারেল জিয়াউর রহমান। তার সামরিক শাসনে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ৩৮নং অনুচ্ছেদের পরিবর্তন এনে ধর্মের নাম ব্যবহার করে রাজনীতি করার বৈধতা দেওয়া হয়। কিন্তু, তিন বছর আগে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট এই সংশোধনীকেই সম্পূর্ণরূপে অবৈধ ও বেআইনি ঘোষণা করেছে। রায়ের পরপরই আইনমন্ত্রী মিডিয়াতে বলেছিলেন, জামায়াতে ইসলাম নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু আওয়ামি লিগের মহাজোট সরকার পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ফের জামায়াতে ইসলামিকে বৈধতা দেয়। এই সংশোধনীতে সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদের বয়ান, বাক্য এবং শব্দশৈলী এমন ভাবে পরিবর্তন করা হয় যে, জামায়াত-সহ ধর্মভিত্তিক দলগুলি বৈধতা পায়। 'জামায়াতকে প্রথমবার বৈধতা দিয়েছিলেন জিয়াউর রহমান এটি যেমন সত্য ; তেমনি মহাজোট সরকার দ্বিতীয়বারের মতো বৈধতা দেয়, এটিও সত্য', বলেছেন সিপিবি সভাপতি।

১৯৭১-এ গ্রেফতার হয়ে যাওয়া রাজাকারদের ১৯৭৫-এ শেখ মুজিব 'সাধারণ ক্ষমা' প্রদর্শন করে জেল থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। সেটিই কাল হয়েছিল। সামরিক বাহিনীর একাংশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তারাই বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে।

ফলে, বাংলাদেশ প্রায় ২০ বছর সামরিক শাসনের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়, গণতন্ত্র বন্দি হয়ে যায়। জামায়াত নামের ধর্ম-ব্যবসায়ীরা ইসলামের নামে ব্যাংক খুলে, নানা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বানিয়ে, কোচিং সেন্টার তৈরি করে দেশের সম্পদকে সন্ত্রাসী কাজে ব্যবহার করেছে। সেই সঙ্গে বিশ্বের বেশ কিছু ইসলামী সংগঠনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদত পাচ্ছে। তাঁদের সঙ্গী হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের বিশ্বাসঘাতক জিয়াউর রহমানের দল বিএনপি। তারাই, গোলাম আযমের মতো রাজাকারদের দেশের মন্ত্রী হতে দিয়েছে। আজও দেশের শত্রু সেই জামায়াতি নেতাদের বাঁচাতে আপ্রাণ লড়ে যাচ্ছে।

আজকের বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম প্রতিশোধ চাইছে না, চাইছে তাঁদের পূর্বপুরুষদের হত্যার বিচার। বিচারে প্রাণদণ্ড দাবি তাঁদের। মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান-সন্ততিরাই আজ শাহবাগের পথে। আর এই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের দুর্বার স্রোতের ধাক্কায় 'জামাত শিবির অনেকটাই হতবাক হয়ে পড়েছে। প্রতিক্রিয়ায় জামাত শিবির কোন কর্মসূচীই দিতে পারছে না। আর এই আন্দোলনের ফলে জামাত শরীকদের কাছ থেকে অনেকটাই দূরে ছিটকে পড়েছে। ...সবচেয়ে বেকায়দায় পড়েছে বিএনপি। তারা আন্দোলনের জন্য বেছে নিয়েছিল আগামী মার্চ মাসকে।...' কিন্তু তার আগেই এই আন্দোলনের ফলে 'বিএনপি এখন সহসাই আন্দোলনের কোন যুতসই সময় পাবে বলে মনে হয় না' বলে লিখেছেন এক ব্লগার। এদিকে, দিন-কে-দিন গোটা বাংলাদেশটাই যত বেশি করে 'শাহবাগ' হয়ে যাচ্ছে, ততই মরণযন্ত্রণায় ছটফট করেছে জামাত-এ ইসলামি ও তার দোসর বিএনপি।

জিনিয়া জাহিদ নামে এক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তথা গবেষক লিখেছেন, 'জামায়াত-শিবির নামক ধর্ম ব্যবসায়ী দলটি সহিংস ঘৃণ্য নীল নকশা তৈরি করে।...ইসলাম রক্ষার এই কল্পিত মিশনে কিছু বুঝে না বুঝেও হারাতে হয় নিরীহ কিছু তাজা প্রাণ।' অন্যদিকে, 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বলীয়ান সাধারণ জনগণ যে শাহবাগে একটি কঠিন পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে, সেটা সরকারবাহিনী কোনও রকম ধারণাই করতে পারেনি।...আওয়ামী লীগ প্রথম দিকে নিশ্চুপ থাকলেও পরে কিছু কিছু নেতা শাহবাগে তাদের একাত্মতা ঘোষণা করতে গিয়ে আন্দোলনকারীদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়। পরবর্তীতে ব্লগার থাবা বাবার হত্যার পর শাহবাগের আন্দোলনে আওয়ামী লীগ সফলভাবেই

□□ ১৯৯২-তে ভারতের নয়া অর্থনীতির পথ চলা শুরু, আর শহিদ-জননী জাহানারা ইমাম তখনই শুরু করলেন ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের ঘাতক- দালালদের নির্মূল করার আন্দোলন। এই আন্দোলনই এখন শাহবাগের চত্বরে, যেখানে মঞ্চে আছে কেবল জাহানারা ইমামের ছবি। ভারতে বিজেপি বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলায় জনমানুষের থেকে অঙ্কটাই অপসারিত হয়, যার প্রমাণ ... ১৯৯৬-এর ভোটে। বাংলাদেশে তখন জাহানারার আন্দোলনের চাপে বিএনপি প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া রাজাকারদের বিরুদ্ধে মামলা করতে রাজি হন। আদতে সেটা ছিল লোকদেখানো।

নিজেদের জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়। ...কালজয়ী স্লোগান ''জয় বাংলা'' যেহেতু বিএনপি নামক দলটির কাছে জখমের মধ্যে নুনের ছিটার মত যন্ত্রণাদায়ক, কাজেই বিএনপির অনেকেই ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও শাহবাগে আন্দোলন থেকে ধীরে ধীরে নিজেদের গুটিয়ে নিতে থাকে।' অর্থাৎ, যে আন্দোলন শুরুতে সরকারেরও বিরুদ্ধেই ছিল, তার রাশ, খানিকটা হলেও, ফের আওয়ামি লিগের হাতে গেল জামায়াত-বিএনপি-র মূর্খামির কারণে।

দু' দেশের সাম্প্রদায়িকতার যোগসূত্র

কেবল ভারতে নয়, এই উপমহাদেশেই সাম্প্রদায়িকতা একটা বড়ো সমস্যা। আর ভারত ও বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার উত্থান-পতনের মধ্যে একটা আপাত-গোপন যোগসূত্র পাওয়া যায়। ইতিহাস বলছে, যখনই ভারতের রাজনীতিতে কট্টর হিন্দুত্ববাদীদের প্রভাব বাড়ছে, বাংলাদেশে জামাতের মদতপুষ্ট সরকার তৈরি হয়েছে।

১৯৭৫-এ আরএসএস-এর গোপন উত্থান ও সেনাবাহিনীতে আরএসএস অনুপ্রবেশ ইন্দিরাকে চিন্তিত করায় তিনি দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেন। তার দু'মাসের মধ্যেই শেখ মুজিবকে সপরিবারে হত্যা করে বাংলাদেশের ক্ষমতা দখল করে জামায়াতের মদতপুষ্ট সামরিক বাহিনী। সেই বছরই নভেম্বরে পর পর আরও দুটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। দু'বছর পর ফের অভ্যুত্থানে ক্ষমতা দখল করেন লেঃ জেনারেল জিয়াউর রহমান। ১৯৭৫ থেকে ১৬ বছর বাংলাদেশ থেকেছে সামরিক বাহিনীর বুটের নীচে। অবশ্য, জিয়াউর রহমান তার ক্ষমতাকে ধরে রাখতে নিজেই বিএনপি নামে দল তৈরি করে ক্ষমতায় ছিলেন। শেখ হাসিনা তখন বাধ্য হয়ে বিদেশে থাকতেন। আবার অভ্যুত্থানের পর অভ্যুত্থান শেষে জিয়াউর রহমান নিহত হন, ক্ষমতায় আসেন লেঃ জেনারেল এরশাদ। এর পর, ১৯৮০ দশকের শেষ দিকে ভারতে বিজেপি-র নেতৃত্বে বাবরি ভাঙার আন্দোলন বাড়তে থাকে। গোটা দেশে সাম্প্রদায়িকতার আগুন ছড়ায়। এদিকে, সামরিক শাসন থেকে মুক্তি পেতে বাংলাদেশে আন্দোলনের চাপে ১৯৯২-তে ভোট হলে জামাতের সমর্থনে ক্ষমতায় আসে বিএনপি। ভারতের ক্ষমতায় তখন সংখ্যালঘু নরসিমা রাও সরকার, আর বিজেপি সংসদে প্রধান বিরোধী দল।

১৯৯২-তে ভারতের নয়া অর্থনীতির পথ চলা শুরু, আর শহিদ-জননী জাহানারা ইমাম তখনই শুরু করলেন ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের ঘাতক-দালালদের নির্মূল করার আন্দোলন। এই আন্দোলনই এখন শাহবাগের চত্বরে, যেখানে মঞ্চে আছে কেবল জাহানারা ইমামের ছবি। ভারতে বিজেপি বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলায় জনমানুষের থেকে অঙ্কটাই অপসারিত হয়, যার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৯৬-এর ভোটে। বাংলাদেশে তখন জাহানারার আন্দোলনের চাপে বিএনপি প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া রাজাকারদের বিরুদ্ধে মামলা করতে রাজি হন। আদতে সেটা ছিল লোকদেখানো। কিন্তু তারই চাপে জামায়াত ইসলামি পরের নির্বাচনে পিছন থেকে আওয়ামি লিগকে সমর্থন করে। আজও কালো দাগ বয়ে বেড়াতে হয় হাসিনার দলকে। ভারতে তখন প্রথমে দেবেগৌড়া, পরে গুজরাল সরকার। বাংলাদেশে এর পর ভোট হয় ২০০১ সালে। পোখরান ও পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ ঘটানোর পর দিল্লিতে বাজপেয়ি সরকার। বাংলাদেশে জামায়াতের সঙ্গে আঁতাত করে ক্ষমতায় ফেরেন খালেদা জিয়া। কিন্তু, এই বছরই ভারতে ক্ষমতায় আসে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইউপিএ। এদিকে জামায়াতের দৌরাত্ম্যে ঢাকায় আসে অস্থিরতা, আর তার পর অন্তর্বর্তী সরকারের পর্ব কাটিয়ে ২০০৯-এ বাংলাদেশে ফের ভোট হয়। দিল্লিতে এই সময় মনমোহন সিং সরকার। ঢাকায় ক্ষমতায় আসে আওয়ামি লিগ নেতৃত্বের মহাজোটের প্রধানমন্ত্রী বেগম হাসিনা।

লক্ষণীয়, ১৯৯০-এর দশক থেকে ভারতের মতোই বাংলাদেশের রাজনীতিও দুটি দলের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। দুটি দলই কার্যত সংখ্যাগুরু ধর্মীয় দলকে তোয়াজ করে গেছে। আর, সেই অপশক্তি ধর্মের নামে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে বিশাল সম্পদ, অর্থের ও সংগঠনের জাল বিছিয়েছে। জামাত, যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতারই বিরোধী, তাঁরা তো বিশাল অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে তার ভাণ্ডারও বানিয়েছে বলে জানা যায়। আওয়ামি লিগের সরকারও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে বিএনপি-কেই প্রধান শত্রু মনে করে। ফলে, আওয়ামি লিগ বা বিএনপি-র শরিক বলে মানুষের আস্থা আর আগের মতো নেই।

শাহবাগের পরিণতি কী ?

শাহবাগের আন্দোলন প্রমাণ করেছে, সেখানকার মানুষ পরিবারতন্ত্র ও সরকারের শাসনে বীতশ্রদ্ধ। তাঁর ফলে, প্রজন্ম চত্বরে ঠাঁই পেয়েছে জাহানারা ইমামের ছবি, অন্য কারও নয়। উচ্চারিত হচ্ছে ভাষা-শহিদ সালাম-রফিক-বরকত- জব্বরদের নাম। আন্দোলনে জড়িয়ে থাকা বামপন্থীরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলছেন, দুর্নীতি ও শোষণমুক্ত বাংলাদেশের কথা বলছেন।

এ-দেশে অনেকেই ভাবছেন, এই আন্দোলনের পরিণতি কী হতে পারে। এমন এক প্রশ্নের জবাবে মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেছেন, 'এই আন্দোলনের পরিণতি কী এটি দুশ্চিন্তা করার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। কারণ ইতোমধ্যেই কিছু অর্জন হয়ে গেছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তরুণ সমাজ নতুন করে ধারণ করেছে। কেউ এটিকে সরিয়ে দিতে পারবে না।...সবাই বলছে, যুদ্ধাপরাধীর বিচার চাই। সরকারের ওপর পুরো নির্ভর করা যাচ্ছে না। আর বিএনপি তো অপরাধীদের কোলে নিয়েই বসে আছে। সুতরাং তরুণরা ভাবছে আমাদেরই পথ বের করতে হবে। এই প্রশ্নে বিকল্প শক্তি আসতেই পারে। তরুণরা মনে করছে আওয়ামী লীগকে দিয়ে হবে না। অন্য কোনো শক্তি তাদের চেতনার বাস্তবায়ন করবে। তরুণদের চেতনায় সমাজতান্ত্রিক শক্তিও বিকল্প হিসেবে গুরুত্ব পেতে পারে।'

'ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক তৃতীয় শক্তির' ডাক ইতিমধ্যেই দিয়েছেন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ)-এর সভাপতি আ স ম আবদুর রব। শাহবাগ আন্দোলন যেন লক্ষ্যচ্যুত না হয় সে ব্যাপারে সজাগ থাকতে আহ্বান জানিয়ে তিনি নতুন প্রজন্মকে নিয়ে তৃতীয় রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'ক্ষমতায় গেলে সরকার মানুষকে মানুষ মনে করে না। রাস্তায় বের হলে গুলি করে। এমন একটি পরিবেশ তৈরি করতে হবে যেখানে গুলি থাকবে না।' কবি ও সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিন বলেছেন, 'বাংলাদেশে এখন আরেকটা যুদ্ধ দরকার— দুই ভিন্ন মতবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ— ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম মৌলবাদের, যুক্তিপূর্ণ ন্যায্য চিন্তাধারা বনাম অযৌক্তিক অন্ধ বিশ্বাসের, যারা এগিয়ে যেতে চায় তাঁদের সঙ্গে পশ্চাদগামী শক্তির, আধুনিকতা বনাম বর্বরতার, নব উদ্ভাবনের সঙ্গে পুরনো ধ্যানধারণার, মানবতা বনাম ইসলামপন্থার, ভবিষ্যৎ বনাম অতীতের, স্বাধীন মতবাদের বিশ্বাসীদের সঙ্গে অবিশ্বাসীদের।'

শেষ করি 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি...' গানটির রচয়িতা আবদুল গাফফার চৌধুরীর কথায়, যিনি নিজেকে এখনও 'ভারতীয় উপমহাদেশের সন্তান' বলে পরিচয় দেন। গাফ্‌ফার চৌধুরী লিখেছেন : 'দেশ ও জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে আজ একটি রাষ্ট্রদ্রোহী চক্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে হবে। সুখের কথা, সামনের কাতারের বুদ্ধিজীবী, যাঁরা কোনো দলের নন, তাঁরাও আবার বিএনপি-জামায়াতের অশুভ তৎপরতার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। ড. আনিসুজ্জামান, ড. আকবর আলি খান, সৈয়দ আবুল মকসুদ, সুলতানা কামাল, রাশেদা কে চৌধুরী, বদিউল আলম মজুমদার প্রমুখ যে এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে সোচ্চার হয়েছেন এবং প্রতিবাদে এগিয়ে এসেছেন, তা বিরাট আশার লক্ষণ। চূড়ান্ত যুদ্ধে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ও শান্তিকামী মানুষের যে জয় হবেই— সে সম্পর্কে আমি সুনিশ্চিত।" □

বিধিসম্মত ঘোষণা

পত্রিকার নাম : দুর্বার ভাবনা
প্রকাশনার ভাষা : বাংলা
প্রকাশনার স্থান : ১২/৫ নীলমণি মিত্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৬
প্রকাশ কাল : মাসিক
প্রকাশকের নাম : ভারতী দে
জাতি : ভারতীয়
ঠিকানা : ১২/৫ নীলমণি মিত্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৬
মুদ্রকের নাম : ভারতী দে
জাতি : ভারতীয়
ঠিকানা : ১২/৫ নীলমণি মিত্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৬
সম্পাদকের নাম : স্মরজিৎ জানা
জাতি : ভারতীয়
ঠিকানা : ১২/৫ নীলমণি মিত্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৬
মুদ্রণ : রয়'স ডট কম
জাতি : ভারতীয়
ঠিকানা : ৪৪ বেনিয়াটোলা স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯

আমি শ্রীমতী ভারতী দে ঘোষণা করছি যে উপরিউক্ত তথ্য ও বিবৃতি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

ভারতী দে (স্বাক্ষর)
প্রকাশক,
দুর্বার ভাবনা।

শবর পরিচিতি

গোপীবল্লভ সিংদেও

কেও বলে শবর, কেও বলে খেড়্যা। এই শবরদের পরিচয় কি— তা জানার আগে, এ জেলার কিছুটা পরিচয় দেওয়া দরকার। জেলার আদি রূপটা জানা থাকলে, শবরদের স্বরূপটা কি— তা জানা যাবে। জেলাটার আদি নাম মানভূম। এই মানভূম ছিল শাল, পলাশ, মহুয়াতে ভরা জঙ্গলময় দেশ। সেদিন এ জেলার একটা নিজস্ব রূপ ছিল, শ্রী ছিল, সৌন্দর্য ছিল, জেলার দেহে ছয়টা ঋতুর প্রকট আবির্ভাব ছিল। এ জেলার দেহে সেদিন বসন্ত আসত। হয়তো সেদিন বনভূমি আর বন্যপ্রাণী, এই ছিল মানভূমের আদি রূপ। সেদিনকার বনভূমি আর বন্যপ্রাণীর দোসর হয়ে— আর এক মানব গোষ্ঠী এখনও আছে— যারা বনভূমি আর বন্যপ্রাণীর মতই এ জেলার আদিমতার দাবিদার—তারাই আজ শবরগোষ্ঠীর মানুষ— যারা আজও আকৃতিতে জংলী, প্রকৃতিতে বুনো, যাদের গা থেকে এখনও বুনো গন্ধ যায় নি— আজও যারা আদিম মানব, নিকটতম প্রতিবেশী বনজঙ্গল আর বন্যপ্রাণীর সঙ্গছাড়া হয়নি--- বনভূমির মায়া কাটাতে পারেনি— এরাই শবরগোষ্ঠীর মানুষ। আজও এরা সমাজবদ্ধ মানুষের সৃষ্টি সভ্যতার শৃঙ্খলে বাঁধা পড়েনি, সভ্য মানুষের তৈরি বুদ্ধিগ্রাহ্য আইন কৌশলে নিজেদের খাপ-খাওয়াতে পারেনি, এই শবররাই এ জেলার আদিম মানবগোষ্ঠী। এ জেলার মানুষ জানে এদের বন-দি গার বলে, খেড়্যা বলে।

আজকের পুরুলিয়া জেলা আর সেই শাল পলাশ মহুয়াতে ভরা জঙ্গলময় দেশ নয়, রুক্ষ, শুষ্ক, খরাক্লিষ্ট পুরুলিয়া। বন জঙ্গল কোনো কোনো জায়গায় তার অস্তিত্বকে কোনোমতে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে, কিন্তু বন্যপ্রাণী প্রায় বিলুপ্তির পথে, সেদিনকার বনজঙ্গল আর বন্যপ্রাণীর অস্তিত্ব আজ যেমন বিপন্ন, তেমনি বন্যপ্রাণীর নিকটতম প্রতিবেশী সেদিনকার আদিম মানব গোষ্ঠী— এই শবরগোষ্ঠীর অস্তিত্বও আজ বিপন্ন। আজকের শবরগোষ্ঠীর মানুষ শুধু যে তার মাতৃভূমিকে হারিয়েছে তা নয়, বনজঙ্গল থেকে প্রাপ্ত সহজলভ্য খাদ্য থেকেও বঞ্চিত হয়েছে। বন্যপ্রাণীর সমগোষ্ঠী হয়ে, যাদের বেঁচে থাকার জন্য বনজঙ্গলকে নির্ভর করতে হতো, আজ বনজঙ্গল নিঃশেষের সঙ্গে এই শবরগোষ্ঠীর মানুষের বেঁচে থাকার পথও অনিশ্চয়তার অন্ধকারে নিমজ্জিত। এমনি এক পরিচয়হীন বিলুপ্তির পথে পথযাত্রী—এক আদিম মানবগোষ্ঠী— এই শবরগোষ্ঠীর পরিচয় দেবার চেষ্টা করছি।

শবরগোষ্ঠীর মানুষদের জানার আগে এরা কেমন জায়গায় কি পরিবেশে বসবাস করে তা জানা দরকার। এমনই একটি শবর পল্লীর পরিবেশের পরিচয় দিচ্ছি, পল্লী মানে পাঁচ-ছয়টি কুঁড়ে ঘর তাও আবার এক জায়গায় নেই, এখানে সেখানে, এমন একটি পুঞ্চা থানার বালকডি গ্রামের নিকটস্থ শবর বস্তির পরিচয় দিচ্ছি। শবর বস্তিটি যেখানে আছে, তা একদিন বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু আজকে কয়েকটি পাথুরে ডুংরির সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নেই। এর কিছু দূরে কাঁসাই নদী বয়ে যাচ্ছে, নদীর ওপারে মানভূমের সম্পদশালী রাকাব বনাঞ্চল। আজ যা আছে তা রাকাবের প্রকৃত পরিচয় নয়, এ জঙ্গলে নানা গাছ-গাছড়া ছিল, গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল; বাঘ ভাল্লুক, হরিণ, বনশুয়োর প্রভৃতি বন্যপশুর আবাসস্থল ছিল। এদের শিকারের কাহিনি ও প্রত্যক্ষদর্শী মানুষের আজও অভাব নেই। কিন্তু আজকে বনজঙ্গল অদৃশ্য হয়েছে, বন্যপশুর বিলুপ্তি হয়েছে— এরা এই শবররা আজও আছে, হয়ত আরও কিছুদিন থাকবে, তারপর বন্যপশুর বিলুপ্তি হয়েছে— এরা এই শবররা আজও আছে, হয়তো আরও কিছুদিন থাকবে, তারপর বন্যপশুর পথ অনুসরণ করবে।

এমনি নির্জন বন্য পরিবেশ, লোকালয় থেকে দূরে এরা বসবাস করতে ভালোবাসে। এটাই শবরদের বৈশিষ্ট্য। এরা আজও তথাকথিত সমাজে আবদ্ধ হয়নি,—সমাজবদ্ধ মানুষ যেখানে পরস্পর সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতার উপর তথাকথিত সমাজ গড়েছে, গ্রাম গড়েছে, সেখানে বসবাস করার অভ্যাস বা প্রয়োজন এদের নেই। গ্রামের মানুষের সংস্রবে আসতেও এরা চায় না। নদীনালা, বনজঙ্গলে ঘেরা এমনই এক নির্জন পরিবেশ বসবাস করার জন্য এদের পছন্দমতো স্থান। নির্জন প্রাকৃতিক পরিবেশ আর নিজগোষ্ঠীর মানুষ ছাড়া আর কারও সঙ্গে সংস্রবও এরা রাখতে চায় না। শবররা আজও কৃষিকাজে অভ্যস্ত হয়নি। সাধারণ মানুষের যা জীবিকা তাতেও এরা অভ্যস্ত হয়নি। সাধারণ মানুষের যা জীবিকা তাতেও এরা অভ্যস্ত হয়নি। মাটির মোহ যেমন এদের নেই, তেমনি মাটির মায়াও নেই। বেশিদিন এক জায়গায় বসবাসও করে না। পুলিশ বা গ্রামের লোক বেশি বিরক্ত করলে ঘর-দুয়ার ছেড়ে অন্য কোথাও পালিয়ে যায়।

শবরদের নিজস্ব কোনো জমি-জমা নেই, কৃষিকাজ জানে না, কোথাও এরা শ্রমিকদের কাজও করে না। তবে বেঁচে আছে কি করে— এ রহস্যের উত্তর হবে--- শবররা খায় কি তা জানা। শবরগোষ্ঠীর মানুষের খাদ্য তালিকা আর তার প্রণালীটুকু জানা থাকলে এদের আদিম গোষ্ঠীর মানুষ বলতে আর কোনো অসুবিধা থাকে না।

শবরদের খাদ্যানুসন্ধান পর্বটিকে কয়েকটি মাসে ভাগ করা যায়। যেমন—

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়—এই তিন মাস এরা বনজঙ্গল থেকে ফলমূল, শিকড় ছাড়াও পাখির বাচ্চা, ঢ্যামনা সাপ, গোই সাপ, ব্যাঙ, শামুক সংগ্রহ করে, তা খাদ্যরূপে ব্যবহার করে। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে নতুন বৃষ্টি হলে, শবর স্বামী-স্ত্রীকে প্রায়ই দেখা যায় বনজঙ্গল, মাঠে প্রান্তরে ঢ্যামনা সাপ, গোই সাপের অনুসন্ধানে ঘুরছে। ঢ্যামনা সাপ প্রায়

ছয় সাত হাত লম্বা, একমুঠো মোটা, দ্রুতগতিতে পালাতে ওস্তাদ; কিন্তু শবরদের গায়ের গন্ধ পেলেই এ হেন ঢ্যামনা সাপ একেবারে নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকে। ঢ্যামনা সাপ শিকার করতে পারলে এরা মহাখুশি হয়, এটা এদের অতি প্রিয় খাদ্য। সাপের চামড়া খুলে তা দোকানে বিক্রি করে, আর বাকি অংশটা পাতার বড়ো একটা খোলা তৈরি করে, তাতে গোল করে সাপটাকে রেখে সামান্য আগুন দিয়ে ঝলসিয়ে নেয়। কাঁটাগুলোকে বেছে মাংসটুকু মহানন্দে মুখে পুরে দেয়। কাক থেকে যে কোনো পাখির বাচ্চা খাওয়ার প্রণালীটি ঠিক ঐরকম।

শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন— এই তিন মাস এরা ক্ষেত থেকে নানা জাতের ব্যাঙ, বড়ো বড়ো শামুক বা ঘঙ্গা, মাছ, নদী-জোড় থেকে কাঁকড়া সংগ্রহ করে, তাই খেয়ে এই কয় মাস বেঁচে থাকে। খাওয়ার প্রণালীও ঠিক ওইরকম। ব্যাঙগুলোকে পাতার খোলার মধ্যে রেখে, সামান্য আগুন দিয়ে খালা খানাকে ঝলসিয়ে নেয়, তারপর পরম তৃপ্তি সহকারে ভোজন পর্বটি শেষ করে। এরা প্রায়ই ভোজন পর্বটি বাইরে কোথাও না কোথাও সেরে ঘরে ফেরে। ঘরে উনান জ্বালা বা রান্না-বান্নার ঝামেলা নেই।

কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ— এই তিন মাস এরা ধান ক্ষেতের আইল থেকে ইঁদুর, ও ইঁদুর গর্তের ধান সংগ্রহ করে। লোহার ছড় বা কাঠের লাঠিতে লোহার ফলা দেওয়া অস্ত্রের সাহায্যে এরা শক্ত শক্ত আইলকে অনায়াসে খুঁড়তে পারে। শবর মেয়েরা এ কাজে পারদর্শিনী। শবর নারীর দেহে কি আসুরিক শক্তি আছে তা চোখে না দেখলে কল্পনাও করা যায় না। ইঁদুর বাচ্চা যেগুলোর এখনও চোখ ফোটেনি এমনি লাল বাচ্চাগুলো পেলে তা তক্ষুণি মুখে পুরে দেয়, এগুলো খেতে আর আগুনের দরকার হয় না।

মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র— এই তিন মাস এরা স্থানীয় ফল সংগ্রহ করে তা খাদ্যরূপে ব্যবহার করে। তা ছাড়া মধু সংগ্রহ করে। মৌচাকের ডিম্বসহ চাক এদের খাদ্য। মধু সময় সময় বিক্রি করে। তা ছাড়াও বন্যপশু শিকারে বার হয়। বন্যপশু মানে শিয়াল, হুড়াল, খরগোশ ইত্যাদি শিকার করে ও খাদ্যরূপে ব্যবহার করে।

বুনো পরিবেশে যারা লালিত, পালিত, জংলী যাদের খাদ্য তারা দেখতে কেমন? স্বাস্থ্যই বা কেমন— তা জানার ইচ্ছা জাগে। এরা নাকি প্রকৃতির আপন সন্তান, প্রকৃতির আপন সম্পদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনাবৃত দেহে রোদ শীত বর্ষাকে সাদরে বরণ করে সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়েছে। পুরুলিয়ার প্রকৃতি দেবী যে রঙ দিয়ে কালো কালো পাথর তৈরি করেছে; সেই একই রঙের তুলি দিয়ে যেন শবরদের গায়ে রঙ চড়িয়েছে। শবর দেখতে মসৃণ কালো নয়, রঙটা ধূসর কালো। কোনো দিনই গায়ে তেল পড়েনি, বুনো হাতির মতো ধূলিধূসর শরীর। তাই এদের 'গা' থেকে উৎকট একটা গন্ধ বার হয়। লম্বায় সাধারণত পাঁচ থেকে ছয় ফুট— মাথা গোল, নাক ছোটো ও চ্যাপ্টা। চোখ ছোটো ছোটো উজ্জ্বল। দৃষ্টি সচকিত চঞ্চল। রাত্রিতে সাধারণের চেয়ে এদের দৃষ্টিশক্তি বেশি। ঠোঁটের পাতা মোটা, কাঁধ মাংসপেশী বহুল, হাত লম্বা, বলিষ্ঠ, লোহার মতো শক্ত। হাতের তালু ভীষণ শক্ত— আঙুলগুলো বেশ মোটা মোটা। বুক ভীষণ চওড়া, মাংস পেশিতে ভরাট। পেট শরীরের সঙ্গে সাঁটানো। সারাদিন মাঠে-ঘাটে ঘোরাঘুরি করে বলে পায়ের পাতা বেশ শক্ত ও সমান। শবরদের দেখলে মনে হয় ওই শরীরে অসুরের শক্তি আছে।

শবরদের ঘরবাড়ি করার ধরণটা দেখলে মনে হয়, এরা স্থায়ী ভাবে বসবাস করার কোনো পরিকল্পনায় ঘরবাড়ি করে না। ঘর বলতে ছয়-সাত হাত উঁচু, পাঁচ-ছয় হাত লম্বা চওড়া মাটির অশক্ত দেওয়ালে সামান্যটুকু খড় দিয়ে ঘর করেছে। এই কুঁড়ে ঘরে প্রবেশ করার জন্য রয়েছে সামান্য দেড় হাতের মাত্র একটি দুয়ার। এমন দুয়ারে কোনোমতে হামাগুড়ি দিয়ে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করা যায়। প্রচণ্ড শীতের হাত থেকে বাঁচবার জন্য ঘরের মধ্যে গর্ত খুঁড়ে রাত্রিতে তার মধ্যে কিছু খড় দিয়ে রাত কাটায়। ঘরের মধ্যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বলতে দু-একটি মাটির ভাঁড় ছাড়া আর কিছুই নেই। শবরদের বসবাস করার ধরণ-ধারণগুলো দেখলেই মনে হবে এরা এখনও স্থায়ী ভাবে বসবাস করার পরিকল্পনা করেনি। সঞ্চয় মনোবৃত্তিতে অভ্যস্ত হয়নি, যাযাবর মনোবৃত্তিও ছাড়তে পারেনি।

শবরদের বেশভূষা আদিমতাকে প্রমাণ করে। পুরুষগুলোর সারা দেহ প্রায় উলঙ্গ, কোমরের নীচে একফালি শতচ্ছিন্ন ময়লা দুর্গন্ধযুক্ত কাপড় দিয়ে নগ্নতা ঢেকেছে মাত্র। সারা শরীর তেলবিহীন ধূলিধূসর। রোদ শীত বর্ষা— এই এদের বেশভূষা। প্রচণ্ড শীতের দিনেও অনাবৃত দেহে স্বাভাবিক ভাবে এরা জীবন কাটায়। দেখলে মনে হবে বন্যপ্রাণীরা যেমন করে রোদ শীত বর্ষায় জীবন কাটায়, শবররাও ঠিক সেই ভাবে আজও জীবন কাটায়। মেয়েদের সাজসজ্জায় কোনো শৌখিনতাই নেই। মাথার চুল রুক্ষ-শুষ্ক-তেলবিহীন, শাঁখা-সিঁদুর-চুড়ির কোনো চালচলন নেই। কোমর থেকে হাঁটু অবধি এক ফালি কাপড় দিয়ে সামনেকার দিকটা ঢাকা। শবর নরনারীর গায়ের গন্ধই এদের পরিচয়। এরা স্বামী-স্ত্রীতে সারাক্ষণ একসঙ্গে থাকতে পছন্দ করে। সারা বছর স্বামী-স্ত্রীতে খাদ্য অন্বেষণ করে। তাই মাঠে-ঘাটে বনজঙ্গলে প্রায়ই দেখা যায়, লোহার ফলা দেওয়া লাঠি হাতে খাবার খুঁজছে।

পুরুষদের চেয়ে নারীরাই বেশি সক্রিয় ও বুদ্ধিমতী। এরাই পুরুষগুলোকে পরিচালনা করে। শবররা এক সঙ্গে দলবদ্ধ ভাবে চলাফেরা করে না। লোকালয়ে বা গ্রামবাসীর মধ্যেও বড়ো বেশি আসে না। বাৎসল্য স্নেহ এদেরও আছে; কিন্তু ছেলেমেয়ে একটু বড়ো হলে আর সঙ্গে থাকে না। মেয়েরা বিবাহ করে, ছেলেরা সাবালক হওয়া মাত্র স্বাবলম্বী হয়ে নিজেরাই নিজেদের খাবার জোগাড় করে। নিঃসঙ্গ বিচ্ছিন্ন মনোভাব শবর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

শবরদের জীবিকার কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই, কোনো বাঁধাধরা নিয়মে চলতে এরা অভ্যস্তও হয়নি। এদের জীবিকা স্বাধীন ভাবে সহজলভ্য খাদ্য আহরণ করা। অবশ্য শবর মেয়েরা অবসর সময় কিছু বাঁশ ও খেজুর পাতার কাজ করে— যেমন বাঁশ থেকে কুলা, খাঁচি, ঝাঁটা, খেজুর পাতা থেকে চাটাই, ঝাঁটা তৈরি করতে জানে। তাই মাঝে মাঝে গ্রামের হাটে তা বিক্রি করতে দেখা যায়।

শবর চরিত্রের একটা সুন্দর দিক আছে, একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এরা ভীষণ সরল। এদের শরীরে আছে অসুরের শক্তি, হৃদয়ে আছে সরল মন। ভয়ংকর শক্তিশালী শরীরে সরল মন, এটাই শবরদের চারিত্রিক সৌন্দর্য। এরা সভ্যসমাজকে এড়িয়ে চলে— সভ্যমানুষকে ভয় করে। আমাদের সভ্যতাকে এরা ঠিকমতো বিশ্বাস করে না। এদের মধ্যে কোনো অসামাজিক মনোবৃত্তিই নেই। তা ছাড়া আমাদের সামাজিক আর অসামাজিক ভেদরেখাটাকে এরা ঠিক ভাবে আজও বুঝে উঠতে পারেনি। ভালো কাজে এদেরও অবদান আছে। বুনো জংলী শবর-রাও আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের জাতীয় সৈনিক। ১৯৪২ সালে বান্দোয়ান, বরাবাজার, মানবাজার, পুঞ্চা, পটমদা থানায় যে কটি থানা ও মদভাঁটির ওপর সফল আন্দোলন চালানো হয়েছিল, সব কটি আন্দোলনে শবরদের

এরপর ১৪ পাতায় ➔

জীবন যন্ত্রণায় পাহাড়িয়া উপজাতি

চণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায়

পাহাড়িয়ারা পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত বাগমুন্ডি থানার অযোধ্যা পাহাড়ের উপকূলবর্তী গ্রামগুলিতে অবলুপ্ত প্রায় অন্যতম উপজাতি হিসেবে পরিচিত। বর্তমানে ১৩০টি পরিবার নিয়ে এদের জনসংখ্যা প্রায় ৬০০।

পাহাড়িয়াদের বসতিগুলির মধ্যে তিলাগোড়া, বড়গোড়া, আমকোচা, কলাবেড়া, চাত্রাজারা, ঝিলিং, সিলিং, খড়বেড়া, পাঁড়রি, বীরসাজন নামক গ্রামগুলি বাগমুন্ডি, বলরামপুর এবং আড়ষা থানার অন্তর্গত। আঞ্চলিক গ্রাম সমাজে পাহাড়িয়ারা পাইড়া (অর্থাৎ পর্বতের মানুষ) নামে পরিচিত। এদের পূর্বপুরুষরা ঠিক কোন্ সময়ে এই অঞ্চলে আগমন করেছিল তা স্মরণ করতে পারে না এরা নিজেরা-ই, কিন্তু এরা বনের জনজাতি—এই পরিচয় প্রজন্মের পর প্রজন্ম বহন করে চলেছে। এদের বসতি নিকটবর্তী থানা থেকে প্রায় ১৫ থেকে ২০ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত। হাঁটা পথ দিয়ে এরা কাছাকাছি এলাকায় যাতায়াত করে। বনজ লতাপাতা এবং খড় দিয়ে ছাওনি সহ নিচু নিচু কুঁড়ে ঘরে বসবাস করে। পাহাড় ঝরনার জল আর বনজ উদ্ভিদ ও জীবজন্তুই হলো জীবনযাপনের অন্যতম উৎস। দৈনন্দিন ক্ষুধা ও দারিদ্র্য হলো এদের নিত্যসঙ্গী।

নিকটবর্তী জঙ্গল থেকে বনজ দ্রব্য এবং শিকার সংগ্রহ পাহাড়িয়াদের দৈনন্দিন পেশার অন্তর্ভুক্ত। কেন্দু, ভেলা, বহড়া, আম, জাম, কুল, তেঁতুল, ডেহু, পিয়াল প্রভৃতি বনজ ফল এবং নানা ধরণের বনজ লতাপাতা, শেকড়, আলু, বাওলা, গুলায়াং, দুধ্যা, বেঙো, মধু ও তসর ইত্যাদি সংগ্রহ করে। ওই সব দ্রব্য নিজেরা উপভোগ করে অথবা কাছাকাছি গ্রামে চাল, মুড়ি, ভাত, গম, মাইজে (বড় ধনা) বা অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করে। যদিও কয়েক দশক আগেও বনজ শিকড়, ফল, পাতা, মধু, মাংস ইত্যাদিই তাঁদের প্রধান খাদ্য ছিল। কিন্তু বর্তমানে চালের বিনিময়ে এই সমস্ত বনজ দ্রব্য সরবরাহ করে থাকে। চিরাচরিত শিকারকেই এরা অন্যতম পেশা হিসাবে গ্রহণ করে থাকে। পাখি, খরগোস, বুনো ভালুক ইত্যাদি শিকার করে। পাহাড়ের চূড়া থেকে ডিম সংগ্রহ করে, আবার পাহাড়িয়া মহিলারা চিহড় পাতার 'ঘং' তৈরি করে তার সঙ্গে দাতন কাঠি এবং কঞ্চি (মুড়ি ভাজার জন্য) নিকটবর্তী বলরামপুর বাজারে বিক্রি করে। একটি ছোটো গানের লাইনে তা ফুটে ওঠে—

সরু সরু শাল কাঠি
ভাগ করি দাতন কাঠি
দাতন বিকে হয় দু-চার আনা...।

পাহাড়িয়াদের ছেলেরা বিয়ের পর পৃথক ঘর বাঁধে, এদের সমাজে বহুবিবাহ এখনও প্রচলিত। দারিদ্র্যের দরুণ পাহাড়িয়া সমাজে পারস্পরিক লেনদেনের প্রথাটি বিলুপ্তি হয়েছে।

চল্লিশ বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পরই এরা বৃদ্ধে পরিণত হয় এবং একাকী জীবন কাটাতে বাধ্য হয়। এই সময়ে খাদ্য সংগ্রহ করতে না পারায় ক্ষুধা হয়ে দাঁড়ায় নিত্যসঙ্গী। প্রতিষ্ঠিত গ্রাম সমাজ থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে বসবাসের দরুণ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে পারে না। অপরিণত বয়সে মৃত্যুর কবলে পড়ে এরা।

পাহাড়িয়াদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার চাল নেই বললেই চলে। অনিয়মিত ভাবে গাছের তলায় পাহাড়িয়া ছেলে-মেয়েরা স্কুল শিক্ষা গ্রহণ করে।

এই জনজাতিটি অতিমাত্রায় ভূত-প্রেত ও ডাইনি শক্তিতে বিশ্বাসী। সারা বৎসর ধরেও শিশুরা এবং মায়েরা একাধিক রোগে ভোগে। এদের বিশ্বাস এই সব রোগের কারণ 'অপদেবতা'। এরকম ক্ষেত্রে ওরা ওঝার সাহায্য নেয়। গ্রামীণ ওঝারা টাকা এবং চাল, মদ, ছাগল, মুবগি ইত্যাদির বিনিময়ে বিভিন্ন ঝাড়ফুঁক ও তন্ত্রের সাহায্যে অপদেবতা তাড়ানোর চেষ্টা করে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রোগী মারা যায়।

পাহাড়িয়ারা চার ধরণের ভূতে বিশ্বাস করে—বড়াম ভূত, মাসের ভূত, চিড়কুন, ডাকিনি। এদের বিশ্বাস, অবিবাহিত পুরুষের মৃত্যু হলে তাঁর প্রেতাত্মা গর্ভবতী মহিলা এবং গৃহপালিত জীবজন্তুতে ভর করে। এইসব ক্ষেত্রে ওঝা মন্ত্রতন্ত্র ঝাড়ফুঁক করে থাকে। গর্ভবতী মহিলা মারা গেলে তার পেট ফেটে ভ্রুণটিকে বের করে দেয়। এদের বিশ্বাস, তা নাহলে এই প্রেতাত্মা ডাকিন ভূতে পরিণত হয়ে অন্যকে আক্রমণ করবে। দূরবর্তী ঝরনা এবং নদী থেকে রাত্রিতে আলোর সাহায্যে চিড়কুন ভূত ভীতির সৃষ্টি করে। মোশার ভূত পাথরের টুকরো অথবা গাছের ডাল অথবা পাহাড়ের মাটি ফেলে নিশানা দেয়। এক্ষেত্রেও পাহাড়িয়ারা ওঝার সাহায্যে নিরাপত্তা খোঁজে।

পাহাড়িয়াদের প্রাকৃতিক জগৎ একাধিক শক্তিকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। এদের মধ্যে 'বুরু' বা পাহাড়ি দেবতা হলো সর্বোচ্চ শক্তি। এছাড়া জাহিরা দেবতার পুজো করে। নারী ও পুরুষরা হাড়িয়া পান করে করম নাচ, দাঁড় নাচ করে থাকে। চৈত্র সংক্রান্তি, ছাতা পরব, কালী পুজো এবং পৌষ সংক্রান্তিতে পাহাড়ের নিম্নবর্তী গ্রামগুলিতে খাদ্য ভিক্ষা করে, বিশেষত মুড়ি, পিঠে ইত্যাদি। এর সঙ্গে সঙ্গে ঝুমুর গানের মাধ্যমে তাদের জীবনযন্ত্রণার প্রকাশ ঘটায়। এরকম একটি গানের লাইনে তাঁদের জীবনযন্ত্রণার কথা ফুটে উঠেছে।

ছৈলা কাঁদে মাই-মাই
ছৈলার মা-তো ঘরে নাই
পাত পুড়া পিঠা খুঁজে সকালে
ছৈলা কাঁদে টুয়েক ভকালে।

সহজ ভাবে বলতে গেলে এর অর্থ হলো মায়ের জন্য শিশু ক্ষুধার্ত হয়ে কাঁদছে এবং সকালবেলায়

এরপর ১৬ পাতায় ➔

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্মৃত প্রতিষ্ঠাতা

অভিজিৎ গুহ

মু খ ব ন্ধ

১৮৯২ সালে বঙ্কিমচন্দ্র 'বাঙ্গলার ইতিহাস' প্রবন্ধে অতি দুঃখে লিখছেন : 'সাহেবরা যদি পাখী মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্তু বাঙ্গলার ইতিহাস নাই।' (পৃ. ২৮৫) কারণ হিসেবে বঙ্কিম উক্ত প্রবন্ধে বলেছেন 'ভারতবর্ষীয়েরা ঘোরতর দেবভক্ত।' অর্থাৎ যাবতীয় জাগতিক ঘটনাবলীর জন্য ভারতীয় তথা বাঙালিরা কখনই নিজেদের কর্মকুশলতাকে গুরুত্ব দেন না। সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা কিংবা ভবিতব্য। একই প্রবন্ধে বঙ্কিমের কথা আর একটু শোনা যাক—'মনুষ্য কেহ নহে, মনুষ্য কোন কার্যেরই কর্তা নহে; অতএব মনুষ্যের প্রকৃত কীর্ত্তি বর্ণনে প্রয়োজন নাই। এ বিনীত মানসিক ভাব ও দেবভক্তির অস্মজাতির ইতিহাস না থাকার কারণ। ইউরোপীয়রা অত্যন্ত গর্বিত; তাঁহারা মনে করেন, আমরা যাহা করিতেছি, ইহা আমাদেরই কীর্ত্তি, আমরা যদি হাই তুলি, তাহাও বিশ্বসংসারে অক্ষয় কীর্ত্তিস্বরূপ চিরকাল আখ্যাত হওয়া কর্তব্য, অতএব তাহাও লিখিয়া রাখা যাউক। এইজন্য গর্বিত জাতির ইতিহাস বাহুল্য; এই জন্য আমাদের ইতিহাস নাই।' (পৃ. ২৮৫-৮৬)

আসলে ইতিহাস রচনা এবং রচয়িতার উপর নির্ভর করে কেউ লিখলে তবে তো ইতিহাস তৈরি হয়। বঙ্কিমের যুগ ছাড়িয়ে আমরা তো অনেকটা এগিয়ে এসেছি। অনেক ইতিহাস তৈরি হয়েছে। লেখালেখিও অনেক হয়েছে। তবু এখনও আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসই অজানা। বহু কীর্তিমান নারী পুরুষের কাহিনি আজও চাপা পড়ে আছে বিস্মৃতির অতলে। প্রাচীন যুগের দেবদেবীর বদলে এখন এসেছেন রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা। মানুষ এখন এঁদের গুণকীর্তনেই অভ্যস্ত। এঁরাই শুরু এবং শেষ করেন। মানুষ এঁদের ভয়েই ভীত। প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতারা আধুনিক দেব-দেবীদের কলরোলে চাপা পড়ে যান। বর্তমান প্রবন্ধে এরকম একজন চাপা পড়ে যাওয়া প্রতিষ্ঠাতার জীবন ইতিহাস নিয়েই আলোচনা করব।

হা রি য়ে যা ও য়া এ ক উ দ্যো গী মা নু ষ অ নি ল কু মা র গা য়ে ন

যদি এরকম একটা প্রশ্ন করি যে, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা কে আর কিভাবেই বা এরকম একটি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল? আমি নিশ্চিত জানি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীরাও এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন না। এমনকি ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীরাও বেশ অসুবিধায় পড়বেন। কিন্তু এরকমটা তো হওয়ার কথা ছিল না। আজ থেকে বছর পাঁচেক আগে এরকম বেআক্কেলে প্রশ্ন করলে অনেকে হয়তো বলেই বসতেন: এটাও জানেন না? অমুক সরকারই তো বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় চালান। অতএব উনি এবং ওঁর দলই এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী বর্ষ যেদিন (২৫-২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৬) পালন করা হয়েছিল। ওই উৎসব উপলক্ষ্যে কলকাতা থেকে আগত পণ্ডিতবর্গ ও তদানীন্তন উপাচার্য রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপনকালীন যে বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন সে সবের মধ্যে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা অনিল গায়েনের জীবনকথা ও কীর্তিকাহিনী চর্চার বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টা ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আজ পর্যন্ত কোনো উপাচার্য তাঁর বক্তৃতায় অনিল গায়েনের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করেননি। 'অনিল গায়েন বক্তৃতা' আজ পর্যন্ত কোনো পণ্ডিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দেননি। অথচ বিগত অনেক বছর জুড়েই আমরা মেদিনীপুর শহরের দেওয়াল লিখন ও পোস্টারে দেখেছি জনৈক 'শিক্ষাবিদ' অধ্যাপকের নাম।

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় চালু হবার পর থেকেই প্রায় ২৭ বছর ধরে ওই শিক্ষাবিদের নাম শোনা গেছে, ওকে দেখা গেছে সর্বত্র বিরাজমান, সর্বজ্ঞ এক সর্বশক্তিমান দেবতার মতো। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সমস্ত ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মচারী আধিকারিকদের দেখা গেছে ওঁর নির্বাচনী মিটিংগুলিতে। তাহলে উনিই তো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। উনি ছাড়া আর কাকেই বা প্রতিষ্ঠাতার শিরোপা পরানো যায়? অনিল গায়েনকে তো আর কেউ চোখে দেখেন নি। আর তাছাড়া গায়েনই যে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রধান চিন্তক ও কর্মবীর ছিলেন তারই বা প্রমাণ কোথায়? ইতিহাসের কোনো ছাত্রছাত্রী বা অধ্যাপক অধ্যাপিকা আজ পর্যন্ত এই প্রশ্ন তোলেন নি। শুরু করেননি মহাফেজখানা নির্ভর কোনো একটি ছোট্ট গবেষণাও।

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের পঞ্চদশ বার্ষিক সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৯৯ সালের ২৪-২৬ জানুয়ারি বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে। ঐতিহাসিকদের রাজ্যব্যাপী এই মহাসম্মিলনে মোট ১০৬টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়েছিল। পঠিত হয়েছিল চারটি বিভাগীয় সভাপতির অভিভাষণ। সম্মিলনে ছিল 'আঞ্চলিক ইতিহাস' নামাঙ্কিত একটি বিভাগ। এই বিভাগটিতে উপস্থাপিত হয়েছিল মোট এগারোটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ। এই সম্মিলনে একটিমাত্র প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস অনুসন্ধান করা হয়েছিল। প্রবন্ধটির গোড়াতেই ছিল অধ্যাপক অনিল গায়েনের বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উল্লেখ। বলাবাহুল্য, প্রবন্ধটি বর্তমান লেখকের। (পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের *ইতিহাস অনুসন্ধান ১৪* (২০০০) গ্রন্থে প্রবন্ধটি মুদ্রিত।) কিন্তু কে আর গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করে রাজনীতির ময়দানে কিংবা প্রশাসনের অন্দরমহলে প্রবেশ করেন? তথ্য প্রমাণ সহযোগে লিখিত গবেষণা প্রবন্ধ ছাপা হয়ে প্রকাশিত হবার পরও ২৫-২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৬

সালে যখন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উৎসব উদযাপন করা হয় তখন সেই উৎসবে জেলার সর্বজ্ঞ শিক্ষাবিদকে রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠানের উপদেষ্টা কমিটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক পদে বসানো হয়। অথচ উনি তখন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কোনো রকমভাবে যুক্ত ছিলেন না। উনি ছিলেন তদানীন্তন অন্যতম শাসক দলের অবিসংবদিত নেতা। এই ভদ্রলোকটি অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ আয়োজিত পঞ্চদশ বার্ষিক সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতিরও সভাপতি ছিলেন। এমনই ছিল ওঁর দাপট। এসব কাহিনির ইতিহাস যে লেখা হয়নি তা নয়। (দ্র. বর্তমান লেখকের 'একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উৎসব', *এককমাত্রা*, ২০০৭)।তবে এইসব দাপুটে শিক্ষাবিদদের দম্ভেই হারিয়ে গেছে প্রকৃত কর্মবীর অধ্যাপক অনিল গায়েনের নাম। তাঁর একখানি ছবি অবশ্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ঘরের সামনে অতিথিদের অপেক্ষা করার জায়গায়। কিন্তু কেউ জানত না ওই ব্যক্তির পরিচয়। কেউ কখনও ওঁর জন্মদিন উপলক্ষে কোনো অনুষ্ঠান পালন করার আগ্রহ দেখান নি। বাঙালি অনুষ্ঠানপ্রিয় জাতি বটে কিন্তু আদৌ আত্মসচেতন নয়। আজও বাঙালির ইতিহাসবোধ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাখ্যাটিকেই সত্যি বলে মনে হয়।

কে ছিলেন এই অনিল গায়েন

অধুনা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার খেজুরি ব্লকের অন্তর্গত লাক্ষী গ্রামে এক মাহিষ্য পরিবারে অনিল গায়েনের জন্ম। পিতা জীবনকৃষ্ণ গায়েন ছিলেন নেহাৎ-ই কৃষিজীবী। অনিলের কোনো শিক্ষিত পূর্বপুরুষের নাম জানা যায় না। ১ ফেব্রুয়ারি ১৯১৯ সালে অনিলের জন্ম। ওঁর ছেলেবেলাতেই বাবা মারা যান। অনিলের মাতা পঞ্চমীদেবী চরম অর্থনৈতিক কষ্টের মধ্যে একটি পুত্র ও কন্যাকে নিয়ে দিন কাটাতেন। অনিলের লেখাপড়া শুরু হয় গ্রামের পাঠশালায়। আট বছর বয়সে স্থানীয় কৃষ্ণনগর মিডল ইংলিশ স্কুলে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন অনিল। ওর প্রথম শিক্ষকদ্বয় স্কুলের হেডমাস্টার ধরণীধর জানা ও পণ্ডিত অধরচন্দ্র মাইতি ইংরেজি ভাষা ও অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি অনিলের আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছিলেন। এরপর ১৯৩১ সালে উনি হেড়িয়া শিবপ্রসাদ শিক্ষায়তনে সপ্তম শ্রেণিতে প্রবেশ করেন। ১৯৩৫ সালে অনিল গায়েন সংস্কৃত ও অঙ্কে লেটার মার্কস নিয়ে ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজ থেকে আবারও লেটার পেয়ে আইএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

এরপর তদানীন্তন রিপন কলেজ (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) থেকে অঙ্কে অনার্স সহ বিএ পাশ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কশাস্ত্রে এমএ ক্লাসে ভর্তি হন ১৯৩৯ সালে। এই সময় অনিলের জীবনে নেমে আসে দুর্বিসহ অর্থনৈতিক অভাব। কলকাতায় থাকতেন রামকৃষ্ণ মিশনের তৈরি দরিদ্র ছাত্রদের ছাত্রাবাসে। ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন কাঁথি রামকৃষ্ণ মিশনের মঙ্গলানন্দ মহারাজ। কলকাতায় প্রাইভেট টিউশন করে নিজের ভরণপোষণ চালিয়ে বাড়িতে মা এবং বোনের সংসার খরচের জন্য টাকা পাঠাতে হতো।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ায় কলকাতা ছাড়তে হলো অনিলকে, বসতে পারলেন না এমএ পরীক্ষায়। গ্রামে ফিরে অত্যন্ত স্বল্প মাইনের বিনিময়ে এক ধনী ব্যক্তির গৃহশিক্ষক হিসেবে কাজ করতে শুরু করলেন পরিবার প্রতিপালনের জন্য। এই চরম দুঃখ-দুর্দশার মধ্যেও লেখাপড়ার প্রতি অনিলের আগ্রহ এতটুকু কমেনি। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে করতেই ফিরলেন কলকাতায় এবং ১৯৪৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফলিত গণিত বিষয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মেধাবী ছাত্র অনিলের টিউশন ফি মকুব করে দেন। এছাড়া পাশে দাঁড়িয়ে-ছিলেন ওর কয়েকজন বন্ধু। এমএ পাশ করে ওঁর কর্মজীবন শুরু হয় হেড়িয়া শিবপ্রসাদ শিক্ষায়তনের শিক্ষক হিসেবে। এরপর অল্প সময়ের জন্য শিক্ষকতা করেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ ও শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। ১৯৪৬ সালে অনিল হাওড়ার ধনী ব্যবসায়ী পঞ্চানন চোঙদারের কন্যা কৃষ্ণাকে বিবাহ করেন। এর কয়েকমাস পরে ২০ আগস্ট ১৯৪৭ সালে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জনের উদ্দেশ্যে ইংলন্ডে যান। মাত্র তিন বছরের মধ্যে ১৯৫০ সালে অনিলকুমার গায়েন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ ডি ডিগ্রি অর্জন করে দেশে ফিরে আসেন ও ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। এর কিছুদিন বাদে অনিল খড়গপুরের আইআইটি-তে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন এবং আমৃত্যু এই প্রতিষ্ঠানেই অধ্যাপনা করেন।

শিক্ষক হিসেবে অনিল গায়েন ছিলেন অত্যন্ত সফল। একই সঙ্গে উনি ছিলেন তাত্ত্বিক ও প্রয়োগধর্মী গবেষণায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এক গবেষক, ইংল্যান্ডের রয়্যাল স্ট্যাটিসটিক্যাল সোসাইটির নির্বাচিত ফেলো। ভারতীয় বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ সম্মাননীয় উপাধি এফএনএ দ্বারা ভূষিত হয়েছিলেন অনিল। উচ্চতম শিক্ষার প্রাঙ্গণে এ ধরণের খ্যাতির ও কীর্তির অধিকারী অনেকেই। কিন্তু অনিল গায়েনের মূল এবং প্রধান কীর্তি শুধু শিক্ষকতা, গবেষণা, বিদেশযাত্রা, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষণা পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধ প্রকাশ ও লক্ষ লক্ষ টাকার গবেষণা প্রকল্প সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এসব কীর্তি আসলে নিজের পেশাগত জীবনচর্যার অন্তর্গত। এসব ছাড়িয়ে খেজুরির প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে উচ্চতম শিক্ষার প্রাঙ্গণে উঠে আসা কর্মবীর অনিল স্বপ্ন দেখেছিলেন অনেক অনেক বড়ো আকারে। সেই স্বপ্নের বাস্তব রূপ আমাদের এই ভালবাসার, এই গর্বের বিশ্ববিদ্যালয়। অনিল গায়েনই প্রস্তাব দিয়েছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয় হবে বাঙলার সেরা শিক্ষাবিদ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামাঙ্কিত এক প্রথাবহির্ভূত বিশ্ববিদ্যালয়। এবার সেই কাহিনি।

আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া

অনিল গায়েন শুধু নিজের খ্যাতি-যশ-অর্থ আর উচ্চাশা নিয়ে চিন্তিত থাকলে উনি প্রেসিডেন্সি কলেজ, আইএসআই, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অথবা বিলেত আমেরিকার কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করে নিশ্চিন্ত জীবন অতিবাহিত করতে পারতেন। এইদিক থেকে দেখলে অনিল গায়েনকে আদৌ কেরিয়ার সচেতন একজন অধ্যাপক মনে হয় না।

যেহেতু অনিল গায়েন স্বার্থমগ্ন উচ্চাকঙ্ক্ষী ছিলেন না তাই তিনি কেম্ব্রিজ ঘুরে এসেও সেই মেদিনীপুরেই ফিরে এলেন। কলকাতা ওকে টানেনি আর পাঁচজন মেদিনীপুরবাসীর মতো। আবার খড়গপুর আইআইটি-র কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ার সহকর্মী অধ্যাপকদের নিয়ে বেশ শাঁসালো কনসালটেন্সি ফার্ম খুলেও বসেননি। অঙ্ক ভালই জানতেন। প্রাইভেট টিউশন করে একসময় সংসার চালিয়েছেন। নিদেনপক্ষে জাঁকালো টিউটোরিয়াল হোম খুলেও বসতে পারতেন। তাও করলেন না!

কি করলেন অনিল গায়েন? স্বপ্ন দেখলেন, স্বপ্নটা অবশ্য বেশ বড়ো মাপের। ভাবলেন একটা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করলে কেমন হয়? আর যদি সেই বিশ্ববিদ্যালয়টা হয় একেবারেই প্রথাবহির্ভূত! পরিসংখ্যানবিদ গায়েন শুধু স্বপ্ন দেখেন নি, NCERT-র কাছে লেখালেখি করে গবেষণা প্রকল্প আনলেন। ঘুরে বেড়ালেন মেদিনীপুর জেলার গ্রাম ও শহরে। সংগ্রহ করলেন শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত বিচিত্র তথ্য। উদ্দেশ্য একটাই--- বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জরী কমিশনকে মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগরের নামাঙ্কিত বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করার জন্য রাজি করানো।

জীবনের শেষ বছর দশেক অনিল এছাড়া আর কিছু ভাবেন নি। তৈরি করলেন Regional Educational Association।

বহুবার দিল্লি গেলেন। প্রস্তাবের পর প্রস্তাব, চিঠির পর চিঠি লিখলেন। সারা দিনরাত হাড়ভাঙা পরিশ্রম করলেন। অবশেষে মঞ্জুরী কমিশন রাজি হলো। সম্মতি মিলল। একই সঙ্গে অক্লান্ত অধ্যাপক গায়েনের শরীরও ভাঙল। বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির কাজ সেরে দিল্লি থেকে ফেরার সময় ১৯৭৮ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি বিমানের মধ্যেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সবাইকে ছেড়ে চলে গেলেন মেদিনীপুরের দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর অনিল কুমার গায়েন।

এরপরের ইতিহাস অনেকেরই জানা। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য ভূপেশচন্দ্র মুখার্জীর লেখায় এর খানিকটা পাওয়াও যায়। গায়েনের প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে গনি কমিটি ও ভবতোষ দত্ত কমিশনের সুপারিশে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৮১ সালে বিধানসভায় বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়ন করেন। ১৯৮৫-৮৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে ছয়টি বিষয় নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় তার যাত্রা শুরু করে। কিন্তু একই সঙ্গে সকলেই ভুলে যান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষাবিদ অনিল গায়েনের কথা।

আসলে গায়েনের কীর্তিকাহিনিকে ভুলিয়ে দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা বহুদিন যাবৎ ক্রিয়াশীল। আগে মেকি শিক্ষাবিদদের দাপটে ভয়ে মানুষ প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার কথা জানতে চাইত না। পরিবর্তনের পরও এই প্রচেষ্টা চালু আছে। সে কারণেই কেউ কেউ উপাচার্যের কাছে চিঠি লিখে বলে ফেলেন— অনিল গায়েনকে নিয়ে লেখালেখি করাটা আসলে নাকি স্থানীয় সংবেদনশীলতায় সুড়সুড়ি দিয়ে জনপ্রিয় হওয়ার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। আবার কেউ প্রশ্ন করে বসেন, আচ্ছা কোনো একজন ব্যক্তির পক্ষে কি একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতার সম্মান পাওয়া উচিত? আবার কেউ বলেন : সবই তো বুঝলাম। অনিল গায়েনই না হয় প্রতিষ্ঠাতা হলেন। কিন্তু সরকারের একটা অনুমোদন এ ব্যাপারে পাওয়া তো দরকার। আর এইসব দত্যিদানোর গোপন দাঁতখিচুনিতে অন্তর্যামী ভয়ে কুঁকড়ে ওঠেন। দু'হাত তুলে বলেন: ধৈর্য ধরুন, সব হবে। আস্তে আস্তে হবে। একবারেই কি পরিবর্তন আসবে? এক পা এগিয়ে দশ কি একশো পা পিছিয়ে আসতে হবে। সে কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির সভায় অনিল গায়েনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য একগুচ্ছ প্রস্তাব সাদরে অনুমোদিত হওয়ার পরেও তার বাস্তব রূপায়ণ থমকে দাঁড়ায়। প্রস্তাব গ্রহণের পরও বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে অধ্যাপক গায়েনের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও ছবি আজও স্থান পায় নি।

এত সবের পরেও কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। অনিল গায়েন নিজের থেকে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু আমরা আজও নিজেদের নিয়েই মশগুল, ক্ষুদ্র স্বার্থে নিমজ্জিত। একমাত্র ছাত্রযুব-শক্তিই পারে অনিল গায়েনের কীর্তিকে প্রকৃত সম্মান জানাতে। 'নব যুগের দেবদেবীদের' ভয় ভুলে একজন মহান মানুষকে সম্মান জানানোর এই তো সময়।

উল্লেখপঞ্জী

১. 'বাঙ্গলার ইতিহাস', ১৮৯২ *বঙ্কিম রচনাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড) সাহিত্য সংসদ (দ্বাদশ মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪০১) কলকাতা।

২. অভিজিৎ গুহ, 'বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ও নিম্নবর্গের মানুষের ইতিহাস রচনা', '*ইতিহাস অনুসন্ধান ১৪*, সম্পাদনা— গৌতম চট্টোপাধ্যায় (প্রথম প্রকাশ ২০০০) ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

৩. অভিজিৎ গুহ, 'একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উৎসব', *একক মাত্রা*, জুলাই ২০০৭, কলকাতা।

৪. স্বপন কুমার মন্ডল সম্পা. 'খেজুরির সেকাল-একাল' ২০০৯, নেতাজি পাঠচক্র, পূর্ব মেদিনীপুর।

৫. Bhupesh Chandra Mukherjee, 'Vidyasagar University : Its objectives and character', *Jarnal of Higher Education*, 1987-88. Vol 13, Nos. 1-3.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই লেখা তৈরিই হত না যদি বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ছাত্র সংসদের প্রতিনিধিরা আমাকে ক্রমাগত তাগাদা এবং উৎসাহ যুগিয়ে না যেত। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ খেজুরীর স্বপন কুমার মন্ডল ও প্রবাল কান্তি হাজরার কাছে। ওঁদের লেখা থেকেই আমি জানতে পেরেছিলাম অনিল কুমার গায়েনের জীবনকথা। সবশেষে কৃতজ্ঞতা জানাব আমাদের প্রয়াত প্রথম উপাচার্য ইতিহাসের শিক্ষক ভূপেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রতি। উনিই প্রথম অনিল গায়েনের সম্পর্কে আমাকে জানিয়েছিলেন।

শবর পরিচিতি

১২ পাতার পর

আত্মদান ও সক্রিয় সহযোগিতার অবদান আছে। শবর নেতা রেবতীবাবু আজ যদি জীবিত থাকতেন তিনি হয়তো বুঝিয়ে দিতে পারতেন— এরা কি অসমসাহসী যোদ্ধার মতো ব্রিটিশ পুলিশের বুলেটের সামনে বুক পেতে দিয়েছে, বন্দুক ছিনিয়ে নিয়েছে, পুলিশের নির্মম অত্যাচার কিভাবে সহ্য করেছে। আমরা দেখেছি ১৯৪২ সালে নওয়াগড় মদভাঁটিতে আগুন দিতে এই শবররাই এগিয়ে এসেছিল— মদ ভাঁটিতে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল।

এই সুন্দর দেহ-মনের মানুষগুলোকে আজকাল চেনাই দায়, বনজঙ্গল এদের ত্যাগ করেছে, সভ্যমানুষ এদের অবাঞ্ছিত বলে মনে করেছে। এই উপেক্ষায়, অবহেলায় এরা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। দেখলে মনে হবে জীবনযুদ্ধে হেরে যাওয়া মানুষ, হয়তো আর বেশিদিন টিকে থাকবে না এমনিতেই এদের শরীরের অবক্ষয় শুরু হয়েছে, তারপর রয়েছে সামাজিক শাসনপীড়িত, তদুপরি রয়েছে পুলিশের নিষ্পেষণ। তাতে এরা আজ এমন এক স্তরে এসে দাঁড়িয়েছে যে, এক্ষুনি এদের জন্য চিন্তা করা দরকার। কিছু একটা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, না হলে পুরুলিয়ার অরণ্য মানবগোষ্ঠী হয়তো শেষ হয়ে যাবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

সুভাষ রায় সম্পা., *পুলিয়ার শবর এবং গোপীবল্লভ সিংদেও*, পুরুলিয়া, ২০০৫, পৃ. ১৭-২১।

পশ্চিমবঙ্গের বাজেট ২০১৩-১৪ : বিশ্লেষণ

সরজিৎ মজুমদার

পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী, শ্রী অমিত মিত্র, সত্য মিথ্যা মিলিয়ে গত অর্থবর্ষ (২০১২-১৩) এবং আগামী অর্থবর্ষের (২০১৩-১৪) যে বাজেট পেশ করেছেন তা বাম জমানার বাজেটের থেকে ভিন্নতর। বাজেটে আর্থিক সংখ্যার হিসাবে কোনো মিথ্যা নেই। শুধু সরকারের এক বছরের সাফল্যের দাবির সততা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। বাজেট বিশ্লেষণে দুটো দিক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমত বাজেট যেহেতু সরকারি একটি আর্থিক হিসাবের নীতিপত্র, সেহেতু দেখতে হবে এই বাজেট কতটা সামগ্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করবে। দ্বিতীয়ত, সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকেও এই বাজেট কতটা সাধারণ মানুষের জন্য আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করবে। এই প্রেক্ষিতেই বাজেটকে বিশ্লেষণ করতে হবে।

বাজেট একটি আগাম সরকারি মোট আয় ব্যয়ের হিসাব। আয়ের দিকে আছে কর রাজস্ব ও কর বহির্ভূত রাজস্ব। বিক্রয় কর, যুক্তমূল্য কর বা ভ্যাট, মোটর গাড়ির সড়ক শুল্ক, ভূমি রাজস্ব, জমি বাড়ি রেজিস্ট্রেশন বাবদ কর, বিদ্যুতের ওপর শুল্ক ইত্যাদি রাজস্ব আয় সৃষ্টি করে। সরকারের ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত যে সুদ এবং সরকারি ব্যবসা ক্ষেত্র থেকে যা মুনাফা আয় করে সেগুলো কর বহির্ভূত আয়ের মধ্যে ধরা হয়। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারি আয়ের একটা অংশ যা রাজ্য সরকার পায় সেটাও কর বহির্ভূত আয়ের অংশ। আর আছে মূলধনী আয়, যা রাজ্য সরকারের ঋণে খাটানো টাকা থেকে সুদ ও আসলে উদ্ধার হয়ে আসে এবং বিভিন্ন সংস্থা থেকে গৃহীত ঋণ বাবদ আসে।

রাজ্যের ব্যয়ের দুটো দিক থাকে। এক, দৈনন্দিন সরকার পরিচালনার খরচ— বেতন, পেনশন, ভর্তুকি, বাড়ি ভাড়া, গাড়ি চালানোর খরচ ইত্যাদি রাজস্ব খাতে খরচ। দুই, মূলধনী ব্যয়। এই ব্যয় থেকে সরকারি স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি হয়, যা সরকারের ভবিষ্যৎ আয়ের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। সরকারি ঋণ পরিশোধও মূলধনী ব্যয়ের মধ্যেই পড়ে। এখানে মূলত চারটি খাতের কথা বলা হলো। রাজস্ব খাতে আয়—কর ও কর বহির্ভূত রাজস্ব খাতে আয়, রাজস্ব খাতে ঘাটতি দেখা দেয়। সরকারের নিজস্ব মোট আয় (রাজস্ব আয় ও মূলধনী খাতে সুদাসল আদায়) থেকে সামগ্রিক বা মোট ব্যয় বেশি হলে রাজকোষ ঘাটতি দেখা দেয়। সেই রাজকোষ ঘাটতি ঋণ করে মেটানো হয়। সুতরাং রাজকোষ ঘাটতির অর্থ সেই বছরের মোট ঋণ।

বামফ্রন্টের শেষ বছরে ২০১০-১১ তে রাজস্ব খাতে ঘাটতি ছিল ১৭,১৬৬ কোটি টাকা। বেতন, পেনশন, ভর্তুকি অন্যান্য সরকারি পরিচালন ব্যয় কর ও কর বহির্ভূত রাজস্ব আয়ের থেকে ওই অঙ্কের টাকাটা বেশি খরচ হয়েছিল। সেই বছর সরকার বাজার থেকে এবং অন্যান্য সংস্থা থেকে ঋণ করেছিল ১৯,৫৩৪ কোটি টাকা। অর্থাৎ বার্ষিক ঋণের ৮৮ শতাংশ খরচ হয়েছে, সরকারের দৈনন্দিন চালু খরচ মেটাতে। তাহলে ঋণের মাত্র ১২ শতাংশ বাকি রইল মূলধনী খাতে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির জন্য। যদিও গত ২০১২-১৩ আর্থিক বর্ষে, যখন নতুন অর্থমন্ত্রী পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করতে পেরেছিলেন, তখন রাজস্ব খাতে ঘাটতি ধরা হয়েছিল ৬,৮৫৮ কোটি টাকা, কিন্তু সংশোধিত হিসাবে দেখা যাচ্ছে ৩১ মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত রাজস্ব ঘাটতি হবে আসলে ১৩,৩০৮ কোটি টাকা, যা বামফ্রন্টের শেষ বছরের রাজস্ব ঘাটতি থেকে প্রায় চার হাজার কোটি টাকা কম। এই বছরে সরকারকে ঋণ করতে হয়েছে ২০,৯১১ কোটি টাকা। অর্থাৎ চালু খাতের রাজস্ব ঘাটতি মোট ঋণের ৬৪ শতাংশ। নতুন অর্থমন্ত্রীর কালে রাজস্ব ঘাটতি কমিয়ে এনে মোট ঋণের ৩৬ শতাংশ টাকা স্থায়ী মূলধন সৃষ্টির জন্য রাখা হয়েছে। যদিও পশ্চিমবঙ্গ ঋণ জর্জরিত রাজ্য, তবুও সরকারি ঋণের অধিকাংশ টাকা বাঁচিয়ে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির চেষ্টা প্রশংসার্হ। আগামী বছরে রাজস্ব ঘাটতি ধরা হয়েছে ৩,৪৮৮ কোটি টাকা এবং মোট ঋণ ধরা হয়েছে ১৩,৪১৪ কোটি টাকা। অর্থমন্ত্রী হয়তো রাজস্ব ঘাটতি এত কম রাখতে পারবেন না। তবুও তাঁর চেষ্টাকে সাধুবাদ জানাতেই হয়।

বর্তমান অর্থমন্ত্রীর ২০১২-১৩ সালের রাজস্ব খাতে ঘাটতি কম হওয়ার বড়ো কারণ কর রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি। তিনি ২০১২-১৩-র বাজেট উপস্থাপনের সময় কর বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরেছিলেন ২০১১-১২-র করের চেয়ে ২৫ শতাংশ বেশি। কিন্তু কর আদায়ের পদ্ধতির ও প্রশাসনিক সরলীকরণের জন্য কর আদায় হয়েছে প্রায় ৩০ শতাংশ বেশি। তার মধ্যে ভূমি রাজস্ব ও জমি বাড়ি নথিকরণের রাজস্ব উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে। আগামী ২০১৩-১৪-তে কর রাজস্ব আরও ২৩ শতাংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা রেখেছেন। এই লক্ষ্যে পৌঁছোনো অসম্ভব নয়। কারণ যে হারে প্রোমোটার রাজ চলছে তাতে জমি, বাড়ি ক্রয় বিক্রয় বাড়লেই ভূমি রাজস্ব বেড়ে এই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছোনো সম্ভব। তাছাড়াও আগামী বাজেটে যুক্তমূল্য কর বা ভ্যাট দুটো স্তরে এক শতাংশ করে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

উচ্চ যুক্তমূল্য কর বাড়ানো হয়েছে ১৩.৫ থেকে ১৪.৫ শতাংশে এবং নিম্ন স্তরে যুক্তমূল্য কর বাড়ানো হয়েছে চার থেকে পাঁচ শতাংশে। উৎপাদন বাড়লেই এই যুক্তমূল্য করের আদায়ের পরিমাণও বাড়বে। তাহলে রাজস্ব ঘাটতি কমবে। অর্থমন্ত্রী আগামী বছরে রাজকোষ ঘাটতির লক্ষ্য রেখেছেন ১৩,৪১৪ কোটি টাকা। অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে নানা উৎসবে টাকা খরচ করে বেড়াচ্ছেন তাতে ঘাটতি পূরণের সম্ভাবনায় সন্দেহ থাকতেই পারে।

রাজকোষ ঘাটতির কারণে ঋণের বোঝা বেড়েই যাচ্ছে। মোট ঋণের বৃহদাংশই বাম আমলে

সৃষ্টি হয়েছে, যার বোঝা বর্তমান মন্ত্রিসভাকে বহন করতে হচ্ছে। আশা করা যায় অর্থমন্ত্রী রাজস্ব আদায় বাড়িয়ে ঋণের পরিমাণ কমিয়ে আনতে পারবেন। অথবা, রাজস্ব ঘাটতি কমিয়ে ঋণের টাকায় রাজ্যের স্থায়ী সম্পদ বৃদ্ধির দিকে নজর দিতে পারবেন। তাহলে রাজ্যের এই সম্পদ থেকেই সৃষ্ট আয় ভবিষ্যতে বাড়বে। আগামী বছরে সামাজিক পরিষেবা ক্ষেত্রে মূলধনী খাতে মন্ত্রী যথেষ্ট টাকা বরাদ্দ রেখেছেন। এবং সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে ২০১২-১৩-র তুলনায় এই বাজেটে মূলধনী ব্যয়ের বরাদ্দ দ্বিগুণ করেছেন। এই টাকা খরচ করতে পারলে উন্নয়ন অবশ্যই হবে। এখানেই বাম জমানার থেকে বর্তমান অর্থমন্ত্রী নিজেকে সদর্থে এগিয়ে রেখেছেন।

এই বাজেটের আরও একটি দিক হলো সরকারের রাজস্ব ও মূলধনী খাতে মোট ব্যয়ের রাশ টেনে ধরা। সরকারের রাজস্ব ও মূলধনী আয় মিলিয়ে মোট (১,০১,২৮৯ কোটি টাকা) চালু রাজস্ব খাতে ও মূলধনী খাতে মোট ব্যয়ের (১,০০,৪৯৯ কোটি টাকা) চেয়ে বেশি হয়েছে। ফলে চলতি বছরে বাজেট উদ্বৃত্ত হয়েছে প্রায় ৭৮৯ কোটি টাকা। যেহেতু গত ২০১১-১২ সালে বাজেট ঘাটতি হয়েছিল ৭৯১ কোটি টাকা, তাই চলতি বছরে নিট বাজেট ঘাটতি দাঁড়িয়েছে—২ কোটি টাকা।

মন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতায় বেশ কিছু অতিরঞ্জিত উন্নয়নের দাবি করেছেন, যা হয়তো সত্য নয়। বক্তৃতায় তিনি বলেছেন, রাজ্যে শ্রমিক হরতাল এবং লকআউটের জন্য বাম আমলে প্রতি বছর ৭৫ লক্ষ শ্রমদিবস নষ্ট হতো। বর্তমানে নতুন সরকারের আমলে নষ্ট হয়েছে মাত্র ৫,০০০ শ্রমদিবস।

বাজেট পেশের পর দিনই রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী বিধানসভায় বলেছেন তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর জুন ২০১১ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত লক আউটের জন্য নষ্ট হয়েছে ৫৫ লক্ষ শ্রমদিবস এবং কর্মীদের হরতালের জন্য নষ্ট হয়েছে ৫,৫৯২ শ্রমদিবস। কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রেও অর্থমন্ত্রী কিছু অসত্য বলেছেন বলেই অনেকে মনে করেন। তিনি বলেছেন এপ্রিল ২০১২ থেকে জানুয়ারি ২০১৩-র মধ্যে ১০,২৪,৫২১ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পেরেছেন। এবং আগামী বছরে ১৩,১৪,০০০ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবেন। এই কর্মসংস্থান কোথায় হয়েছে, কী শর্তে হয়েছে, সে বিষয়ে তিনি নীরব রয়েছেন। কোথা থেকে হবে এত কর্মসংস্থান? রাজ্যে শিল্প নেই। এই রাজ্যে সারা বছরে মাত্র ৩২২ কোটি টাকার বিনিয়োগ হয়েছে। বর্তমান কালে শিল্প বিনিয়োগ পুঁজি নিবিড়, শ্রম নিবিড় নয়। ৩২২ কোটি টাকায় ৩২২ জনেরও কর্মসংস্থান হওয়া সম্ভব নয়।

কৃষিক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই। সুতরাং কর্মসংস্থান যা হবে তা অসংগঠিত ক্ষেত্রে হলেও হতে পারে। কর্মসংস্থান যদি এতই সহজে হতো, তাহলে রাজারহাট বা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে সিন্ডিকেট রাজ চলতে পারত না। মন্ত্রীর এই দাবিগুলো তাই একটু বাড়াবাড়ির পর্যায়েই চলে গেছে।

এটা ঠিক যে উন্নয়ন হলে গ্রামীণ উন্নয়নের পথই ধরতে হবে। সেইমতো অর্থ বরাদ্দও করা হয়েছে। সেচ ব্যবস্থায় জোর দেওয়ার জন্য কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বাড়তে পারে। তাহলে রাজ্যের ক্ষুদ্র কৃষকদের আয় বাড়বে। সেই আয়ের অধিকাংশই যদি ব্যয় হয়, তাহলে কার্যকর চাহিদা বেড়ে নতুন বিনিয়োগের সুযোগ করে দিতে পারে; ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেতে পারে।

আশার কথা রাজ্যে আগামী বছরে পরিকল্পিত ব্যয় বাড়ানো হয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। এতে ভালো ফল হলেও হতে পারে। বাজেট যেহেতু একটি বছরের আগাম অনুমিত হিসাব, তাই বাজেটের ফলাফলের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে আগামী বছর পর্যন্ত। □

জীবন যন্ত্রণায় পাহাড়িয়া উপজাতি

১১ পাতার পর

পিঠে চাইছে। কিন্তু মা কাঠ আর খাদ্য সংগ্রহ করতে জঙ্গলে গেছে তাই শিশু খিদে পেলেই কাঁদছে।

বর্তমানে পাহাড়িয়াদের আর্থিক লেনদেনের জন্য গ্রামীণ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আদান প্রদানে লিপ্ত হতে হচ্ছে, কিন্তু এই লেনদেনের সময় মুনাফা সংক্রান্ত জটিলতা ওরা সহজে বুঝতে পারে না। ওদের একটি গানের লাইনের মধ্যে দিয়েও তা ফুটে উঠেছে।

শাল পাতার পাতরি
দোকান বাবুর দরাদরি
লৈতন পয়সা নাহি জানি শুনা—

অর্থাৎ শাল গাছের পাতা ছোটো ছোটো থোকা করে দোকানির কাছে বিক্রি করি, কিন্তু দোকানির হিসাব মতো নতুন পয়সা, দরাদরি ও তার পরিমাণ বুঝতে পারি না।

গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গে লেনদেন করতে গিয়ে পাহাড়িয়ারা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। জঙ্গলের জগতের সঙ্গে পরিচয় নিয়েই এরা বাঁচতে চায়। আর সেই কঠোর জীবন যন্ত্রণার কথা একটি ছোট্টো গানের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছে—

পাতা তুলি নিতি নিতি
ঝুড়ি ঝাঁটা দাঁতন কাঠি
আজ বাবু করে কেনে মানা
উহাদের বন কি নাহি ছিল জানা—

এই গানে বলা হচ্ছে, সুদূর অতীতকাল থেকে আমরা বনের পাতা তুলে ঝুড়ি, ঝাঁটা তৈরি করে জীবন নির্বাহ করে আসছি। এই বাবুরা কি বনের ধারা জানে না?

কিংবা আরও একটা গানের মধ্যে দিয়েও তাদের এই যন্ত্রণার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়—

ঝুড়ি ঝাঁটা বিকি কিনি
ঘাম ঝিঁটা মাড় পানি
আজ কেনে করে জরিমানা
কি করে বাঁচাবো ছানা পোনা।

সহজ কথায় বলতে গেলে কঠোর পরিশ্রম করে ঝুড়ি ঝাঁটা বিক্রি করে মাড় জল দিয়ে বাচ্চাদের বাঁচাই। আজকে বনবাবুরা কেনে জরিমানা করছে? কি ভাবে বাচ্চাদের বাঁচাব?

খুবই সাম্প্রতিককালে জাপানি কোম্পানির সাহায্যে অযোধ্যা পাহাড়ে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের দরুণ সমস্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সম্পদ বিপর্যস্ত হয়েছে। এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে এই স্বল্প সংখ্যক টিকে থাকা জনজাতিটির উপর। এরা দ্রুত বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। ফলে ব্যাপক ভাবে এদের গ্রাস করছে হতাশা, নৈরাশ্য।

অদূর আগামীতে হয়তো এই জনজাতির ক্ষুদ্রাকার মানুষগুলির মধ্যে আর বেজে উঠবে না জীবনের জয়গান—

ঝোপে ঝাড়ে পাহাড়ে
মাদাইল শিঙ্গা বাজারে। □

উনিশ শতকের বাংলার চাষি : এক অক্ষয় আর্কিটাইপ

তরুণ বসু

১৮৭১ সালে উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮০৮-৮৮) বাংলার গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষের সামাজিক ও গৃহজীবন সম্পর্কে বাস্তব কাহিনির উপর ভিত্তি করে ইংরেজি বা বাংলা ভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের জন্যে পঞ্চাশ পাউন্ড পুরস্কার ঘোষণা করেন। প্রতিযোগিতার বিচারক ছিলেন রমানাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দিগম্বর মিত্র, রেভারেন্ড জে লং ও স্যার ডব্লিউ জে হার্সেল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার সুকুমার সেন লিখেছেন, এই পুরস্কারের জন্যে লালবিহারী দে এবং বঙ্কিমচন্দ্র উভয়েই উদ্যোগী হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন *বিষবৃক্ষ* আর লালবিহারী *Bengal Peasant Life* এবং পুরস্কারটিও তিনিই জিতে নেন। নিজের অভিজ্ঞতা অবলম্বনে ইংরেজি ভাষায় লেখা 'অ-রোমান্টিক'[১] এই উপন্যাসে লালবিহারী উনিশ শতকের বাংলার পল্লি জীবনের যে চিত্র এবং কৃষকের যে আর্কিটাইপ চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন, এই একুশ শতকেও সে-চিত্র অমলিন।

উপন্যাসটি প্রথমে লেখা হয়েছিল *বেঙ্গল পিজ্যান্ট লাইফ* শিরোনামে। পরে কলেবর কিছুটা বাড়িয়ে নাম পরিবর্তন করে হয় *গোবিন্দ সামন্ত*। এই পরিবর্ধিত সংস্করণটি বেরোয় ১৮৭৪ সালে। প্রকাশক ম্যাকমিলান অ্যান্ড কোম্পানি, লন্ডন। ১৮৭৮ সালে এর একটি নতুন সংস্করণ বের হয় এবং ১৮৭৯ থেকে ১৯০৯-এর মধ্যে ১৩ বার পুনরমুদ্রিত হয়। উপন্যাসটির প্রথম বাংলা অনুবাদ বেরোয় ১৮৮৩ সালে। অনুবাদ করেছিলেন ভুকৈলাসের (খিদিরপুরের) সত্যবাদী ঘোষাল। লালবিহারী দে বিষয়ে গবেষক দেবীপদ ভট্টাচার্য-র দেওয়া তথ্য, সত্যবাদী পুরোটা নয়, শুধু প্রথম খণ্ডটি অনুবাদ করেছিলেন। তবে লেখকের জীবিতাবস্থায় এবং তারপরও বহুদিন ইংরেজি সংস্করণটি খুবই জনপ্রিয় ছিল। এরপর ১৯৫৩ সালে মন্মথ নাথ সরকার *বাংলার চাষি* শিরোনামে ইংরেজি *গোবিন্দ সামন্ত*-র অনুবাদ করেছিলেন—কয়েকটি অধ্যায় বাদ দিয়ে। কারণ তাঁর সঠিক ভাবেই মনে হয়েছিল 'বাংলার চাষের কাজ, হাটবাজার ইত্যাদিরও বর্ণনা করা হয়েছিল, অনাবশ্যক খুঁটিনাটি নিয়ে। বাঙালি পাঠকদের মধ্যে এগুলির প্রয়োজন নেই বলে তা ছেঁটে ফেলা হয়েছে।' (প্রথম সংস্করণের ভূমিকা।) উপন্যাসটি লেখার সময় লালবিহারীর মাথায় ছিল ইংরেজি পাঠকদের কথা হয়তো সে-কারণে তিনি অনেক বেশি খুঁটিনাটি বর্ণনার দিকে ঝুঁকেছিলেন।

যেহেতু মূল ইংরেজি গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য, আমাদের আলোচনার কেন্দ্রে তাই বাংলা সংস্করণটি। এই ২০১৩ সালে দুটি প্রকাশনা সংস্থা থেকে যথাক্রমে *বাংলার চাষি* এবং *গোবিন্দ সামন্ত* নামে গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে। প্রথমটির প্রকাশক 'চর্চাপদ' (কলকাতা ৭০০১৪) এবং দ্বিতীয়টির প্রকাশক 'সেরিবান' (বাখরা হাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা)। অনুবাদকের নাম এবং দু'একটি বাড়তি অধ্যায়ের ব্যতিক্রম ভিন্ন অনূদিত দুটি গ্রন্থই হুবহু এক। যদিও মূল আলোচনার সাপেক্ষে বিষয়টি গৌণ তবু এই লেখার শেষে এ-প্রসঙ্গে একবার ফিরে আসব।

বাংলার চাষি বা *গোবিন্দ সামন্ত* উপন্যাসটি উনিশ শতকের বাংলার এক চাষির জন্ম থেকে মৃত্যুর মধ্যে বাঁধা হলেও তৎকালীন গ্রামীণ বাংলার রায়ত, রায়তের জীবনযাত্রার এক অসামান্য দলিল। তবে উনিশ শতকের এক পল্লি কৃষকের যথাযথ অবস্থানটি বুঝতে আমাদের একটু পিছন থেকেই শুরু করতে হবে।

১৭৬৪ সালে ইংরেজ বণিক দেওয়ানি লাভ করে। এবং রাজস্ব আদায়ের ভার পায়। এই আদায়ের ব্যবস্থাটিকে পাকা করার জন্যে ইংরেজরা নানা পন্থা অবলম্বন করেছিল, যেমন প্রথমে একশালা, তারপর পাঁচশালা, তারও পরে দশশালা ব্যবস্থা। কিন্তু কোনো ব্যবস্থায়ই মনোমতো আদায়ের সুবিধা করতে না পেরে কর্নওয়ালিশ প্রথমে বাংলায় এবং পরে বিহার ও ওড়িশায় চালু করলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা। সাল ১৭৯৩। এই ব্যবস্থায় একটি নির্দিষ্ট অংকের খাজনা প্রত্যেক জমিদাররের উপর ধার্য হয় এবং এই অর্থই তাকে প্রতি বছর শোধ দিতে হতো। বছরের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই খাজনা কোম্পানির ঘরে জমা দিলে বংশানুক্রমে জমিদাররা জমির স্বত্বাধিকারী থাকবে আর ভবিষ্যতে জমির মূল্য যাইই হোক কোম্পানির বন্দোবস্তর কোনো পরিবর্তন হবে না। এই বন্দোবস্ত-র ফলে ১৮০০ সালের মধ্যে বাংলার ভূমি-ব্যবস্থায় একটা বড়ো পরিবর্তন হয়। যেমন, শস্যের পরিবর্তে 'মুদ্রা কর' প্রবর্তনের চেষ্টা। এর আগে রাজস্ব বাড়ত কিংবা কমতো, তাতে রায়তের সুবিধে হতো। এখন জমির উপর খাজনা দিতে হবে, রাজস্ব নয়। এছাড়াও জমির মালিকানা আর কৃষকের কিংবা পল্লি গোষ্ঠীর রইল না। তা হলো রাজার সম্পত্তি। রাজা জমির মালিকানা ইজারা দিয়ে দিল নানা খাজনা-জোগানদারদের হাতে, পক্ষান্তরে এরাই হলো জমিদার এবং কার্যত জমির মালিক। এই নীতিতে কৃষক খাজনা না দিতে পারলেই তাকে জমি থেকে উৎখাত করা যেত।

লালবিহারীর *গোবিন্দ সামন্ত* বা *বাংলার চাষি*-র কাহিনির বিস্তার মোটামুটি ১৮০০ সালের শুরু অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলার ভূমি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের সময় থেকে ১৮৭০-এর দশক পর্যন্ত। স্থান বর্ধমান, যে অঞ্চল সুদূর অতীত থেকে বঙ্গের অন্যতম সুজলা-সুফলা জেলা। মুঘল যুগের অর্থনীতির হাল আমলের গবেষক শিরীন মুসভির লেখায় দেখছি, ষোড়শ শতকের শেষ দশকে সম্রাট আকবরের রাজত্বের শেষদিকে কৃষিজ উৎপাদনে ভারতের প্রধান প্রধান অঞ্চলের মধ্যে অন্যতম ছিল এই জেলা। (শিরীন মুসভি, *ইকোনমি অফ দ্য মুঘল এম্পায়ার, সি ১৫৯৫* , অক্সফোর্ড, দিল্লি, ১৯৮৭।)। উনিশ এমনকি এই একুশ শতকেও এ-জেলা পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম শস্যভাণ্ডার।

উনিশ শতক ভারতের এবং বাংলার ইতিহাসের এক মাহেন্দ্রক্ষণও বটে। শুধু ব্রিটিশ শাসন নয়, শুধু ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন নয়, এই শতক একই সঙ্গে বহু পরিবর্তনের সময়। বাংলার তথাকথিত সংস্কৃতির এবং 'বাবু কালচারে'রও শুরু এই শতকে। সর্বোপরি ১৮০০ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে বাংলার তথাকথিত বিদ্বৎসমাজের বৃহত্তর অংশের জন্ম। কলকাতা তখন ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী। ফার্সি ভাষার পরিবর্তে চালু হচ্ছে সরকারি স্তরে ইংরেজি ভাষা, শুরু হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক ইংরেজি শিক্ষারও। এই শতকে প্রতিষ্ঠা হয়েছে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, ১৮১৭-য় হিন্দু কলেজ, ১৮২৪-এ সংস্কৃত কলেজ, ১৮৩৫-এ মেডিকেল কলেজ অফ বেঙ্গল, ১৮৪৯-এ বেথুন স্কুল, ১৮৫৭-য় (সিপাহি বিদ্রোহের বছরে) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহ আরও বহু প্রতিষ্ঠানের। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি প্রকাশিত হতে শুরু করেছে ইংরেজি এবং বাংলা সংবাদপত্র। এদেশের প্রথম ইংরেজি সংবাদপত্র *হিকিস বেঙ্গল গেজেট* প্রকাশিত হয় ১৭৮০ সালে। ১৮১৮-য় কলকাতা থেকে প্রকাশিত হলো প্রথম বাংলা সংবাদপত্র *বাঙ্গাল গেজেটি*, শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র *দিগ্দর্শন*, ১৮২১-এ *সংবাদ কৌমুদি*, ১৮৩১-এ *সংবাদ প্রভাকর* এবং ইয়ংবেঙ্গলের *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৪৩-এ *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*, ১৮৫৩-য় *হিন্দু পেট্রিয়ট*, ১৮৫৮-য় *সোমপ্রকাশ* ইত্যাদি। বাংলার তথাকথিত মধ্যশ্রেণির উদ্ভবের সময়ও এই উনিশ শতক।

এই শতকেই জন্মেছিলেন লালবিহারী, ১৮২৪ সালে। বর্ধমানের অখ্যাত গ্রাম সোনা পলাশীর এক দরিদ্র সুবর্ণবণিক পরিবারে। বাবা ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। বাল্যেই গ্রামের পাঠশালায় তাঁর পাঠ আরম্ভ হয়। ৯ বছর বয়সে গ্রামের পাঠশালা ছেড়ে কলকাতায় আসেন ইংরেজি শিক্ষার উদ্দেশ্যে। অর্থাভাবে হিন্দু কলেজ বা হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভর্তি হতে পারেন নি তাই ডাফ সাহেবের বিনা বেতনের স্কুলে ভর্তি হলেন। আইরিশ মিশনারি আলেকজান্ডার ডাফ শুধু শিক্ষা দানের উদ্দেশ্য নিয়ে কলকাতায় আসেন নি। তার উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্টধর্মের প্রচার ও প্রসার।

লালবিহারী ১৮৪৩ সালের ২ জুলাই খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন। ১৮৪৬-এ তিনি ডাফ সাহেবের চার্চে ধর্ম-উপদেশক হিসেবে কাজ করেন। ১৮৭২-এ হুগলী মহসিন কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেওয়ার আগে ১৮৫১-য় ধর্ম-উপদেশক হিসেবে বর্ধমানের অম্বিকা-কালনায় যান। এখান থেকে *অরুণোদয়* নামের একটি পাক্ষিক পত্রিকা চালাতেন। এই সময়েই তিনি গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রা, অভাব-অভিযোগ, উৎসব-অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিষয়ে নিবিড় ভাবে জানালেন। মনে থেকে যাওয়া কৈশোরের পল্লি-ছবি, কর্মজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষিত যুক্তিবাদী মন তাঁর উপন্যাস *চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান* (১৮৫৮) বা *গোবিন্দ সামন্ত* (১৮৭৪)-কে ঋদ্ধ করেছে, সন্দেহ নেই। একথা সত্যি যে, তাঁর প্রথম উপন্যাস *চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান* লিখেছিলেন বাংলায় কিন্তু *গোবিন্দ সামন্ত* এবং তারও পরে *ফোক টেলস্ অফ বেঙ্গল* (১৮৭৮) তিনি লিখেছিলেন ইংরেজিতে।[২] *চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান* খানিকটা প্রচার ধর্মী হলেও *গোবিন্দ সামন্ত* তা নয়। আর *ফোক টেলস্ অফ বেঙ্গল* একেবারেই যুগযুগ ধরে চলে আসা পল্লি-রূপকথা, যা তিনি সংগ্রহ করেছিলেন বহুদিন ধরে বহুশ্রমে।

গোবিন্দ সামন্ত গ্রামীণ বাংলার চাষি জীবনের বিশেষত অন্ত্যজ মানুষের সামাজিক অর্থনৈতিক চিত্র শুধু নয় কিংবা উনিশ শতকের এক কৃষকের জীবনযাত্রাও শুধু নয়, এই কাহিনি বাংলার পল্লিচিত্রেরও এক নিপুণ ছবি।[৩] যে ছবিতে ধরা আছে এক পল্লি কৃষকের চারপাশ ঘিরে থাকা মানুষ-প্রকৃতি- পরিবেশ- অর্থনীতি- সংস্কৃতি- ধর্ম- শিক্ষা-সংস্কার- জাতপাত-জমিদার রায়ত সম্পর্ক-নীলচাষ- দুর্ভিক্ষ- মহামারি সবই। উপন্যাসটির শুরুই হচ্ছে উপশিরোনাম 'বাংলার ধাত্রী' দিয়ে। অন্ত্যজ জাতির এক ধাত্রীর পূর্ণ পরিচয় খুবই ছোট্ট এই অধ্যায়ে নিপুণ ভাবে এঁকেছেন লালবিহারী। যেমন, তার বাড়ি 'পল্লির গৃহবহুল অংশ' পেরিয়ে গ্রামের 'প্রান্তদেশে। ... চাল দেওয়া মাটির দেওয়ালের ঘর। মেঝের মাঝখানে মা ও মেয়ের তালপাতার মাদুরের বিছানা পাতা। চার কোণে কতকগুলো মাটির হাঁড়ির সমাবেশ। ঐ সমস্ত হাঁড়িতে চাল, আনাজ, তেঁতুল, লবণ, সরষের তেল ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস। গৃহে আসবাব পত্রের বালাই নেই। বাগ্দীর মেয়ে রূপার মা, দারিদ্র্যই তার সম্বল। .... রূপার মার প্রকৃত নাম কী তা খুব কম লোকেই জানে।'

একান্নবর্তী পরিবারের কর্তা বদন-এর দ্বিতীয় সন্তান, ১ম পুত্র, *গোবিন্দ সামন্ত*-র নায়ক গোবিন্দর জন্মধাত্রী রূপার মা। স্ত্রী, মা, দু'ভাই, এক ভ্রাতৃবধূ ও এক কন্যা নিয়ে ভরন্ত সংসারের কর্তা বদন—বাংলার লক্ষ লক্ষ চাষির একজন। সম্পন্ন পরিবার নয়, তবে হতদরিদ্রও নয়। চাষবাসই তাদের মূল জীবিকা। এরকম চাষি পরিবারের বাড়ি-ঘর-সংসার, জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু, হিন্দু বিধবা, ধর্ম, ভূত-ওঝা-গুনিন সংস্কার-কুসংস্কার সবই লালবিহারী সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম ভাবে বর্ণনা করেছেন। হিন্দু সংস্কারের প্রতি একদিকে যেমন কিছুটা ব্যঙ্গাত্মক তিনি যেমন 'টিকটিকির ডাক' কিংবা রাতের বেলায় 'এক ডাকে উত্তর না দেওয়া', অন্যদিকে আবার তাঁর শ্রদ্ধা হিন্দু মরণোত্তর শ্রাদ্ধ-আচারে অশৌচ পালনে, যা 'শুচি বোধেরই একটা অংশ। এর কল্যাণে হিন্দু চাষিদের পরিধেয় বস্ত্রাদি ধোপদুরস্ত না হলেও তারা পরিধেয় বস্ত্র দিনের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে একবার জলকাচা করে এবং স্নানের পর কাচা কাপড় পরে। সারা পৃথিবীতে এরকম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কৃষক সম্প্রদায় আর দ্বিতীয় কোনো আছে বলে মনে হয় না।'

লালবিহারী নিজেও জন্মেছিলেন অখ্যাত গাঁয়ে। দরিদ্র পরিবারে। গাঁয়েই তাঁর কৈশোর কেটেছে, শিক্ষারও শুরু। চাষি গোবিন্দর শৈশবের শিক্ষার শুরুর মধ্যে তাঁর নিজের শৈশবের শিক্ষার শুরুরও একটা ছাপ হয়তো পাওয়া যায়। উনিশ শতকের এই সময়ে গ্রামীণ চাষি পরিবারে শিক্ষার অভাব ছিল প্রকট। যে কারণে প্রতিনিয়ত জমিদার-গোমস্তা-মহাজনের হাতে নানা ভাবে তাদের অত্যাচারিত হতো। ফলত, নিরক্ষর চাষি পরিবারের সন্তানকে লেখাপড়া শেখানোর উদ্দেশ্যে পাঠশালায় পাঠানোর একটা আগ্রহ সে-সময়ে তৈরি হওয়া স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, শিক্ষার প্রতি লালবিহারীর আগ্রহের নমুনা পরবর্তীকালে শিক্ষা প্রসারে তাঁর ভূমিকা থেকে জানা যায়। তাঁর ধারণা হয়েছিল, ব্যাপক জনশিক্ষাই কৃষকদের দুর্দশা দূর করতে পারে। তৎকালীন জমিদাররা ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত শিক্ষা সেসের বিরোধিতা করলেও তিনি সরকারের সিদ্ধান্তকেই সমর্থন জানিয়েছিলেন। এমনকি জনশিক্ষার জন্যে এ-ধরণের কর ধার্য করা যেতে পারে বলে তাঁর মতামত জানিয়েছিলেন 'প্রাইমারি এডুকেশন ইন বেঙ্গল' প্রবন্ধে।

লালবিহারী তাঁর উপন্যাসের নায়ক গোবিন্দকে গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি করালেও প্রথম পুরুষে শিক্ষালাভ করতে আসা গোবিন্দর কাছে পাঠশালার বিধিনিষেধ অসহ্য বোধ হতো বিশেষত পণ্ডিতের অকথ্য নির্যাতন। '... মস্ত বড় একটা বাঁশের কঞ্চিও

সব সময়ই তার কাছে থাকত। শুধু ছাত্রদের পিঠে ও মাথাতে এই বংশদণ্ড বেজে উঠত।...আঙুলের গাঁট, হাঁটুর গোড়ালিতেও আঘাত করত।... শাস্তি দেওয়ার এক বিখ্যাত পন্থা ছিল নাড়ুগোপাল প্রক্রিয়া। অপরাধী বালককে এক হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বসিয়ে, প্রসারিত দুই হাতের উপর দুখানা ইঁট রাখা হতো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তাকে এই অবস্থায় বসে থাকতে হতো। হাত থেকে ইঁট পড়লে ... মাথার উপর অনবরত কঞ্চির আঘাত বর্ষিত হতো।... গাছের গুঁড়িতে হাত পা বাঁধা অবস্থায় আটকে ফেলে, তার সারা অঙ্গে বিছুটির পাতা প্রয়োগ করা হতো। নখ দিয়ে আঁচড়িয়ে যে কিছুটা উপশম করবে তারও উপায় থাকত না।' এ কোনো একজন পণ্ডিতের মস্তিষ্কপ্রসূত নয়। 'চিরন্তনী প্রথা হিসেবেই পল্লি বাংলার পণ্ডিত মহাশয়গণ এর অনুসরণ করে এসেছেন।' গ্রামীণ পাঠশালার এবং পণ্ডিতমশাইদের এই ছবি লালবিহারী পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে বিশেষত গল্প-উপন্যাসে এমনকি এই হাল আমলেও আমরা পাই। এই ব্যবস্থায় শিক্ষার প্রতি শিশুর কতটা আগ্রহ থাকে জানি না, তবে উপন্যাসের নায়ক গোবিন্দর ক্ষেত্রে দেখি তার লেখাপড়ার সলিল সমাধি ঘটতে। এরপর শুরু হয় পাঠশালা ছেড়ে স্মরণাতীত কাল ধরে চলে আসা, প্রকৃতির পাঠশালায় গোবিন্দর পাঠ গ্রহণ। তার জীবনপ্রবাহ তখন ভেসে চলতে থাকে বাপের সংসারে। একসময়ে কালের নিয়মে বৃদ্ধা ঠাকুমা ও বাবার মৃত্যু হয়। বিধবা কাকি বৈষ্ণবী হয়ে গৃহত্যাগ করে। অবিবাহিত কাকার জীবদ্দশাতেই 'গোবিন্দ এখন এই চাষি পরিবারের কর্তা, বাড়ি-ঘরের অবস্থা পূর্বেকার মতো রয়েছে।' আর আমরা দেখি কর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ গোবিন্দ জমি-জমা, বাড়ি-ঘর, সংসার ছাড়াও কিছু 'ঋণে'রও উত্তরাধিকারী হয়। সেই ঋণ আরও ভালো পরিমাণ বাড়ে বাবা-ঠাকুমার শ্রাদ্ধে। 'এই ঋণ সত্য সত্যই ভয়াবহ...'। উপন্যাসের প্রথম পর্বের শেষ এখানেই।

কাহিনির দ্বিতীয় অংশের শুরু বাংলার জমিদার রায়ত সম্পর্ক দিয়ে। এই অংশেই উনিশ শতকের চাষির জীবন সংগ্রামের পূর্ণ পরিচয় মেলে। লালবিহারী যে বিষয়গুলো এখানে রেখেছেন তা হলো— জমিদার- জমিদারের অত্যাচার- চাষির রাজনৈতিক বৈঠক ও সংগ্রাম- গ্রাম্য মহাজন- নীল কুঠি কুঠিয়াল- পুলিশি তদন্ত- পঞ্চম আইন- দুর্ভিক্ষ মহামারি। এই পর্বে উনিশ শতকের জমিদারের প্রকৃত রূপটিও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'জমীদার— বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের শুরুই করছেন 'জীবের শত্রু জীব; মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য; বাঙ্গালী কৃষকের শত্রু বাঙ্গালী ভূস্বামী। ব্যাঘ্রাদি বৃহজ্জন্তু, ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তুগণকে ভক্ষণ করে; রোহিতাদি বৃহৎ মৎস, সফরীদিগকে ভক্ষণ করে; জমীদার নামক বড় মানুষ, কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে।' একই সঙ্গে ভালো জমিদারের কথাও বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন শহুরে জমিদারদের কথা, যারা নিজেরা জমিদারী দেখে না, দেখে নায়েব-গোমস্তারা, এবং তারাই অত্যাচারটা করে। লালবিহারীও তাঁর উপন্যাসে বলছেন, কাঞ্চনপুরের জমিদার 'এমন এক শ্রেণীর জমিদারের অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে দেশের সবচেয়ে বড় অভিশাপ বলা যেতে পারে। লোকটা প্রজাদের কাছে সাক্ষাৎ যমদূতে'-র পাশাপাশি দেখিয়েছেন, অন্য এক জমিদার যিনি নীলকরের বিরুদ্ধে চাষির সহায় হচ্ছেন। এই 'নতুন জমিদার ... কলকাতার হিন্দু কলেজের ছাত্র।' ইনি 'পৈতৃক জমিদারির দেখাশুনার ভার গ্রহণ করেই ... ঘোষণা করেন যে, তাঁর জমিদারিতে জোর যার মুলুক তার নীতি পরিত্যক্ত হবে; প্রজারা আবওয়াব, মাথট, সেলামি ইত্যাদি কর থেকেও অব্যাহতি পাবে। আমলারা সেলামি আওয়াব পার্বনী ইত্যাদি নিতে পারবে না।' কিন্তু সারা বাংলাদেশে এমন জমিদার যদি থেকেও থাকত তাহলে তার সংখ্যা এতটাই নগণ্য ছিল যে, বাংলার রায়তদের অবস্থার কোনো ইতর-বিশেষ হয়নি। আমরা ইতিহাসে দেখছি, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফসল হিসেবে উঠে আসা বেশির ভাগ নতুন জমিদারদের উদ্দেশ্য ছিল শুধুই মুনাফা, এই 'টাকাওয়ালা ''দেওয়ান'' ''গোমস্তারা'' কোম্পানির প্রভুদের কৃপায় এই মুনাফার ব্যবসায়ের মালিক হইয়া নতুন জমিদার গোষ্ঠীর পত্তন করিলেন। ইহাদের অর্থলোভ স্বভাবতই ছিল অপরিমিত। কারণ অনেকেই ছিলেন কোম্পানির সাহেব সুবার অনুচর, দালাল, বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি... ইংরেজ ''কুঠি''র কাঞ্চন মানদণ্ডই ইহাদের নিকট প্রধান। ভারতীয় অভিজাত শ্রেণীর পদবীতে উন্নীত হইবার আশা তাহাদের ছিল না, ... কিন্তু কর্নওয়ালিশের কৃপায় একেবারে সেই অভিজাত পর্যায়েই এক শ্রেণীর স্থান পাইবার সুযোগ হইল জমিদার রূপে, অথচ মুনাফার হিসাবেও জমিদারী তাহাদের নিকট অত্যন্ত লোভনীয়।" (গোপাল হালদার, *সংস্কৃতির রূপান্তর*, কলকাতা ১৩৯০, পৃ. ২৩৩।) তারা রায়তদের বিষয়ে কোনো ভালো-মন্দের কথা যদি নাও বলে থাকেন, তাতেও পল্লির অপকার কিছু কম হয় নি। যেমন রায়তের কুটির বর্ণনায় লালবিহারী লিখেছেন, 'পানীয় জল সংগ্রহ করা হয় গ্রামের বাইরে অবস্থিত বড় বড় পুকুরের থেকে' ... 'এই দিঘিতে কেউ বড়ো একটা স্নান করে না। ... কস্মিনকালেও এই দিঘির পঙ্কোদ্ধার করা হয়নি বলে, নানা জাতীয় জলজ উদ্ভিদে ইহা পরিপূর্ণ।' কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে এই সম্পদ ছিল পল্লির। পল্লিসমাজই তার সংস্কার-রক্ষণাবেক্ষণ করত। বন্দোবস্তের পরে এর মালিক হলো জমিদার, এবং এরা বেশির ভাগই ছিল জমিদারি কিনে নেওয়া নতুন জমিদার। এরা '...শিক্ষায় (অথবা উহার অভাবে), রুচিতে (উহারও অভাবে) সেই পল্লি সংস্কৃতিকে ধারণ করিতে পারিলেন না। খাল বিল নদীনালা মজিয়া চলিল, পথঘাট জল সংরক্ষণের ও নিষ্কাষণের নালাগুলি, এই সবের দায়িত্ব তারা গ্রহণ করিলেন না। তাঁহারা শহরের মানুষ, কাজেই পল্লী-সংস্কৃতির সমাদর বুঝিতেনও না। তাহাদের মধ্যে যাহারা জমিদারীর মধ্যে বাস করিতেন... তাঁহাদেরও ক্রমেই চোখ পড়িল সাহেবদের ও কোম্পানির কায়দার দিকে। সর্বত্রই কৃষি সংস্কৃতির ... দুর্দিন আসিল।' (ঐ, পৃ. ২৩৩।)

১৭৭২ শকের (১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ) *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-র একটি সংখ্যায় লেখা হয়েছিল : ' ''যে রক্ষক সেই ভক্ষক'' এ প্রবাদ বুঝি বাঙলার ভূস্বামী-দিগের ব্যবস্থার দৃষ্টেই সূচিত হইয়া থাকিবেক। ভূস্বামী ... ছলে বলে কৌশলে তাহাদিগের [প্রজার] যথাসর্বস্ব হরণে একাগ্রচিত্তে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকেন। তাহাদিগের দারিদ্র্য দশা, শীর্ণ শরীর, ম্লান বদন, অতি মলিন চীর বসন, কিছুতেই তাঁহার পাষাণ হৃদয় আর্দ্র করিতে পারে না, ... তিনি ন্যায্য রাজস্ব ভিন্ন বাটা, যথাকালে অনাদায়ী রাজস্বে নিয়মাতিরিক্ত বৃদ্ধি, বাটার বৃদ্ধি, বৃদ্ধির বৃদ্ধি, আগমনী, পার্বনি, হিসাবানী প্রভৃতি অশেষ প্রকার উপলক্ষ করিয়া ক্রমাগতই প্রজা নিপীড়ন করিয়া থাকেন। .... ভূস্বামীর ভবনে বিবাহ, আদ্যকৃত, দেবোৎসব বা প্রকারন্তরে পুণ্যক্রিয়া বা উৎসব ব্যাপার উপস্থিত হইলে প্রজাদের অনর্থপাত উপস্থিত; তাহাদিগকেই ইহার সমুদয় বা অধিকাংশ ব্যয় সম্পন্ন করিতে হয়।'

'অ-রোমান্টিক' *গোবিন্দ সামন্ত*-র নায়কের বৃহত্তর জগতে প্রবেশের শুরু এই অনর্থপাত দিয়ে, 'জমিদারের ছেলের বিয়ের জন্য প্রত্যেক রায়তের

কাছে এই মাথট আদায় করা হচ্ছে।' এবং 'তিনদিনের মধ্যে ... দিতে না পারলে, তোমাকে হাতাসাই করে এখানে [কাছারিতে] নিয়ে আসা হবে।'[৪] এরপরেই লালবিহারী লিখেছেন, 'বাংলার রায়তকে জমিদারের এই রকম অত্যাচারের মধ্যে কাল কাটাতে হয়েছে। এ-অবস্থার ...অবসান ... কতদিনে যে হবে তা-ও অনিশ্চয়তার গর্ভে লুক্কায়িত।' গোবিন্দ সামন্ত উপন্যাস রচনারও আগে ১৮৫১-র জুনে *Calcutta Review* পত্রিকায় তিনি বাংলার রায়তদের সম্পর্কে লিখেছিলেন : They have been greatly abused, Systematic oppression from time immemorial has paralyzed their energies, deprived them of their native manliness and reduced them to the ignoble condition of slaves. Their own countrymen have proved to be their cruelest oppressors and most inveterate foes. The Zaminder's Katchery is the scene of the ryots degradation where he is derided, spat upon and treated as if he were the veriest vermin of creation.

শেষপর্যন্ত গোবিন্দকে মাথট দিতে হয়, জুতো পেটা খেতে হয় এবং জমিদার তার ঘর পোড়ায়। এই ঘটনায় বিদ্রোহের একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা তৈরি হয়। কিন্তু গাঁয়ে গোবিন্দর স্বজাতির 'সংখ্যা মাত্র পঁচিশ ঘর। একা তারা কী করতে পারে?' কারণ 'অন্যান্য চাষিরা জমিদারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো স্বপ্নেরও অগোচর মনে করে। তাছাড়া ইংরেজ গভর্নমেন্ট তখন জমিদারদের হাতে অসীম ক্ষমতা দিয়েছিল। জমিদাররাও ছিল অত্যাচার আর অনাচারের মূর্তিমান বিগ্রহ।' ইতিমধ্যেই গোবিন্দর ঘরে ঢুকে থাকা, বাংলার রায়তের আর এক শোষক গ্রাম্য মহাজনের কাছ থেকে আরও চড়া সুদে আরও ধার করে, নতুন ঘর বাঁধলেও, ঘর পোড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার খাজনা দেওয়ার দাখিলাও পুড়ে গিয়েছিল। এটাই ছিল জমিদারের অন্যতম উদ্দেশ্য যাতে 'বাকি না-থাকা' খাজনার মিথ্যে দাবির সাহায্যে গোবিন্দকে উচ্ছেদ করা যায়। 'তখনকার রাজস্ব বিধিতে সাংঘাতিক দুটো ধারা ছিল। উক্ত বিধির সপ্তম ও পঞ্চম ধারা।' ১৭৯৯-এ কোম্পানি সরকার যে সপ্তম রেগুলেশান পাশ করে সেটিই কুখ্যাত হপ্তম নামে পরিচিত। এই আইন-বলে প্রজা ঠিক সময়ে খাজনা দিতে না পারলে জমিদার প্রজার স্বত্ব নাকচ বা তার সম্পত্তি ক্রোক করার অধিকারী হয় এবং তাতেও পুরো খাজনা আদায় না হলে তাকে বাঁধা মজুরের কাজ করতে বাধ্য করে। এছাড়াও বকেয়া খাজনা আদায়ে তাকে গ্রেফতারের ক্ষমতা পায়। এর ফলে রায়ত-পীড়ন প্রবল আকার ধারণ করে। আগে রায়ত পালিয়ে বাঁচত, এখন সে-সুযোগও রইল না। জমিদার শুধু জমির নয় প্রজারও মালিক হলো। এই ক্ষমতার অপব্যবহার হতে থাকায় ১৮১২-য় কোম্পানি পঞ্চম রেগুলেশন পাশ করে। যদিও জমিদারের কোনো ক্ষমতাই তাতে খর্ব হয়নি। তার প্রমাণ খাজনা ও বেআইনী সেস আদায়ের পরিমাণ বন্দোবস্তের দু'দশকের মধ্যে বেড়ে তিনগুণ হয়। বাঁচার জন্যে তাই উনিশ শতকের চাষিকে মিথ্যে খাজনাও শোধ করতে হতো। গোবিন্দকেও হলো। কিন্তু তার সুখের দিন আর ফেরে না। আসে মহামারি। মাতৃহীন হয় গোবিন্দ। আক্রান্ত গোবিন্দ নিজে রক্ষা পায়। কিন্তু মহামারিকে অনুসরণ করে আসে দুর্ভিক্ষ।

লালবিহারীর বাঙালি জাত্যাভিমান ছিল যেমন ব্রিটিশ শাসনের প্রতিও ছিল প্রবল দুর্বলতা। ১৮৫৬ সালে ওড়িশার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে তার কিছুটা প্রমাণ মেলে। এই দুর্ভিক্ষে বহু মানুষের মৃত্যু ঘটে। এতেও ছোটোলাট সিসিল বিডন কোনো তৎপরতা দেখাননি। কৃষ্ণদাস পাল ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ *হিন্দু পেট্রিয়ট* ও *বেঙ্গলি* -তে এর তীব্র সমালোচনা করেন। কিন্তু লালবিহারী সরকারের পক্ষ সমর্থন করেন। *গোবিন্দ সামন্ত*-য়ও তাঁর এই মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে, 'ভারত সরকার পূর্ব থেকে প্রস্তুত হয়, দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্টদের বাঁচাবার জন্যে বহু খাদ্যশস্য সঞ্চিত রাখে।... ফলে দুর্ভিক্ষের প্রকোপে তত বেশি লোকক্ষয় হয় না।' যদিও দুর্ভিক্ষ থেকে রক্ষা পায় না তাঁর নায়ক গোবিন্দ। তারপর অনাবৃষ্টি। ফসল ভালো হয় না। তাকে ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হতে হয়। সংসার চালাতে সে গ্রাম ছেড়ে শহরে যায়— মজুরের কাজে। উপন্যাসে সেটা ১৮৭৩ সাল। এই সূত্রে আমরা উল্লেখ করতে পারি, সেন্সাস কমিশনার টমাস মনরো-র একটি হিসেব, ১৮৪২ সালে ভারতে কোনো ভূমিহীন কৃষক ছিল না। ১৮৭২-এ মাত্র ৩০ বছর পর এর সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৫ লক্ষ। এ এক অদ্ভুত সমাপতন। লালবিহারীও উপন্যাসের অন্তিমে দেখান, চাষি গোবিন্দ প্রবীণ বয়সে দিন-মজুরের হীন জীবন- যাপনের গ্লানি আর পরিশ্রম সহ্য করতে না পেরে শহরের নির্বান্ধব স্বজনহীন পরিবেশে মারা যায়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার চাষিকে চূড়ান্ত ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। তাদের দিনযাপন হয়ে উঠেছিল অসহনীয়। এর সঙ্গে যোগ হয়েছিল নীলকরদের অত্যাচার— যাতে জমিদাররা চাষির পক্ষে কোনো ভূমিকাই গ্রহণ করত না। ১৮৫৯-এর বঙ্গীয় খাজনা আইনের আগে তাদের দুর্বিষহ অবস্থার উপর কোনো প্রলেপ পড়েনি। এই লেখার শুরুতেই উনিশ শতক সম্পর্কে সামান্য আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল এইটাই যে, যে সময়কে বাংলার তথা ভারতের রেনেসাঁ বলে গর্ব করা হয়, যার প্রথম সারিতে ছিল সে-সময়ে গড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত শ্রেণি, তা অনেকটাই শহুরে-সংস্কার। তখনও এমনটাই ভাবা হয়েছিল। *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-য় তাই সঙ্গত বিশ্লেষণ : 'যাহারা কেবল কলিকাতাস্থ ও কথিপয় অন্য নগরস্থ কতকগুলি বিশেষ লোকের সম্পদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বঙ্গদেশের শুভাশুভের বিষয় আলোচনা করে ... আধুনিক নব্যসম্প্রদায়ীদিগকে ইংরেজদিগের বেশভূষা ও আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিতে দেখিয়া ... তাহারাই বলে যে অধুনা বঙ্গদেশের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু যে সমস্ত লোক বঙ্গদেশের অন্তর্বর্তী সমস্ত পল্লীগ্রামস্থ মনুষ্যের অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া দেখে এবং ... তাহাদিগের সহিত কথোপকথন করিয়া নানা প্রকার দুঃখের কথাবার্তা শ্রবণ করে, তাহারা আর কখনই বলিতে পারে না যে এক্ষণে বঙ্গরাজ্যের বিশেষ দুর্দশা ভিন্ন কোন অংশে ইহার উন্নতি হইয়াছে।' (১৮৭৮ শক, ১৫৬ সংখ্যা) শুধু *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-য় নয় হরিশচন্দ্রের *হিন্দু পেট্রিয়ট* পত্রিকায়ও গ্রামীণ বাংলার দুর্দশার অনেক সাক্ষ্য পাওয়া যায়। যে উনিশ শতক শহরের আলোক বর্তিকাধারী সেই-ই আবার গ্রাম বাংলায় নিরবচ্ছিন্ন তমসাবাহী।

ঠিক এই ধারাতেই উনিশ শতকের বাংলার চাষি গোবিন্দকে অনায়াসে গেঁথে দেওয়া যায় বিশ বা একুশ শতকের দরিদ্র চাষির সঙ্গে। শহর দিয়ে গ্রাম ঘেরার 'মহাযজ্ঞ উন্নয়নে'-র শিকার এ যুগের চাষি আর জমিদারের হাতে লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত, উচ্ছেদ হওয়া চাষির তফাৎ কি খুব বেশি?

সাম্প্রতিক প্রকাশিত দুটি অনুবাদ প্রসঙ্গে

চর্চাপদ সংস্করণ *বাংলার চাষি* সম্পর্কে আমার একটু খোঁজখবরের সূত্রে শ্রী সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান *গোবিন্দ সামন্ত* নামের আর একটি অনুবাদের কথা। সহজাত কৌতূহলে বইটি সংগ্রহ করি। প্রকাশক সেরিবান। অনুবাদকের নাম , তৃতীয় বন্ধনীর ভেতর 'ভূমিকা ও ভাষান্তর: দেবীপদ ভট্টাচার্য'। *বাংলার*

এরপর ২৫ পাতায় ➔

কৃষি সংকট ও জিন প্রযুক্তি

পুষ্প মিত্র ভার্গব

৩০ অগাস্ট, ২০১২-য় একচেটিয়া আগ্রাসন বিরোধী মঞ্চ, অন্যান্য ভাতৃপ্রতিম সংগঠনের সহায়তায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী সভাগৃহে একটি বক্তৃতা সভার আয়োজন করেছিল — কৃষি সংকট ও জিন শস্য বিষয়ে। মূল বক্তা ছিলেন অধ্যাপক পুষ্প মিত্র ভার্গব এবং সাংবাদিক (*ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*) দেবীন্দর শর্মা। গত সংখ্যায় শ্রী শর্মার অভিভাষণটি এবং এই সংখ্যায় প্রকাশ করা হলো অধ্যাপক পুষ্প মিত্র ভার্গব-এর ইংরেজি অভিভাষণটির বাংলা অনুবাদ। ভাষান্তর **প্রতুল মুখোপাধ্যায়**। শ্রী মুখোপাধ্যায় ও একচেটিয়া আগ্রাসন বিরোধী মঞ্চকে এই সুযোগে কৃতজ্ঞতা জানানো হলো — সম্পাদক

... ... জিএম প্রযুক্তি নিজের পরিচয়েই এক বিস্ময়কর প্রযুক্তি। আজ বিকেলেই আমি বন্ধুদের বলছিলাম, আজ থেকে পাঁচশ বছর পরে যদি বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস লেখা হয়, তাহলে বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক প্রগতির বিশেষ চিহ্নস্বরূপ পাঁচ-ছটি প্রধান প্রযুক্তির মধ্যে জিএম প্রযুক্তি অবশ্যই স্থান পাবে। অতীতে জিএম প্রযুক্তি থেকে পাওয়া বহু সুযোগ সুবিধার কথা আমাদের কখনই ভোলা উচিত নয়। এখন যে সব ব্র্যান্ড [brand : ব্যবসায়িক ছাপ বা মার্কাযুক্ত পণ্য] পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়, তার মধ্যে তিনটি পণ্য লক্ষ লক্ষ মানুষকে রোগের প্রতিকারে সহায়তা করেছে। সেই তিনটি পণ্যই তৈরি হয়েছে জিএম প্রযুক্তির মাধ্যমে এবং জিনগত ভাবে পরিবর্তিত এমন জীবসত্তার [organism] মাধ্যমে যেগুলি কারখানার চার দেয়ালের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। এই সমস্ত জীবসত্তার পরিকল্পনাই করা হয়েছে এমন করে যে সেগুলি কারখানার চার দেয়ালের বাইরে চলে গেলে আর টিকে থাকতে পারবে না। মানব দেহের ইনসুলিনের ব্যাপারটাই ধরা যাক। আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগেও মানবদেহের ইনসুলিন পাওয়া যেত না। তাই ডায়াবেটিস (মধুমেহ) রোগীদের গোরুর বা শুয়োরের দেহের ইনসুলিন ব্যবহার করতে হতো। তখন এমন অনেক মানুষকে ডায়াবেটিস রোগের কষ্ট থেকে রেহাই পাবার জন্য ইনসুলিন ব্যবহার করতে হতো, যাঁরা কিন্তু গোরুর দেহের ইনসুলিন সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত মারা যেতেন। আজ যে তাদের মতো লক্ষ লক্ষ মানুষ রক্ষা পাচ্ছেন, তার কারণ এখন মানবদেহের ইনসুলিন বাজারে পাওয়া যায় আর সেগুলি তৈরি হয় জিন-প্রযুক্তির মাধ্যমেই। তা ভারতেও তৈরি হয় এবং তার খরচও লক্ষণীয় ভাবে কমে গেছে। কিন্তু কোনো জিন প্রযুক্তিতে প্রস্তুত জীবসত্তাকে মুক্ত করে দেওয়া (releasing), তা সে ব্যাকটিরিয়াই (জীবাণু) হোক বা উদ্ভিদই হোক— একেবারেই আলাদা ব্যাপার। তার কারণ হলো, একে একবার মুক্ত করে দিলে আর ফিরিয়ে আনা যায় না। সমস্যাটা সেখানেই। কারখানার চৌহদ্দির মধ্যে জিন-প্রযুক্তির মাধ্যমে একটি ওষুধ তৈরি হলো। ওষুধটা কাজ করল না। তখন ওষুধটা আর তৈরি হলো না। এখানেই গল্প শেষ। কিন্তু উদ্ভিদের বেলায় তো আর তা হবে না। শুধু তাই নয়, আমাদের সামনেই এখন জিএম শস্যের বিপক্ষে অনেক সাক্ষ্যপ্রমাণ এসে গিয়েছে। আমি তো বলব, কম পক্ষে যাদের মধ্যে অন্তত কোনো স্বার্থগত সংঘাত নেই এমন সুপরিচিত বিজ্ঞানীদের লেখা এবং অনেক সুবিখ্যাত বিজ্ঞান-বিষয়ক সাময়িক পত্রে প্রকাশিত এক হাজারের মতো গবেষণাপত্রে জানানো হয়েছে প্রাণীদের স্বাস্থ্যের উপর এবং মানুষের স্বাস্থ্যের উপর এবং পরিবেশ ও মাটির উর্বরতার উপর জিএম শস্যের ক্ষতিকর প্রভাবের কথা। এই সব জ্ঞানচর্চার সিদ্ধান্তকে তো আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। সে কারণেই, জিএম শস্যকে মুক্ত করে দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমাদের খুব সাবধান হতে হবে। পদ্ধতিটা কী হওয়া উচিত? আমার মতে কাজটা করতে হবে এই ভাবে :

প্রথমেই ঠিক করা দরকার, এর আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে কি না। এ জন্য অবশ্যই সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। বিটি তুলোই একমাত্র জিএম শস্য যাকে গবেষণাগারের বাইরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। যদি আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায় এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, যা বিটি তুলো (যাকে মুক্ত করা হয়েছিল) বা বিটি বেগুন (যা মুক্ত করা যায় নি) এ দুইয়ের কোনো ক্ষেত্রেই ছিল না, তখন খুঁজে বার করতে হবে এর বদলে কী কী বিকল্প ব্যবস্থা আমাদের আয়ত্তে আছে। শস্যের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি বিকল্প ব্যবস্থা রয়েছে। জৈব কীটনাশক ও জৈব সার নিয়ে অর্গানিক কৃষিব্যবস্থা তো অনেক বেশি ভালো ও কার্যকর। কলকাতা থেকে খড়্গপুর যেতে হলে আপনি নিশ্চয়ই কলকাতা থেকে চেন্নাই গিয়ে এরপর নাগপুর হয়ে খড়্গপুর যাবেন না। অতএব যদি সহজতর বিকল্প থাকে তবে সেগুলিই ব্যবহার করা উচিত। যদি এমনই অবস্থা হয় যে কোনো বিকল্পই পাওয়া যাচ্ছে না; তাহলে পদ্ধতিটিকে পরীক্ষা করতে হবে নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে। এ জন্য করতে হবে ত্রিশটির মতো পরীক্ষা (test) যেগুলি প্রয়োজনীয় বলে বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানীরা স্বীকৃতি দিয়েছেন। এ পরীক্ষাগুলি ঠিকমতো করে উঠতে বছর কুড়ি লেগে যেতে পারে। সেই পরীক্ষার নিরাপত্তা প্রমাণিত হওয়ার পরেও একটা ঝুঁকি থেকেই যায়। সুবিধা পাওয়াটা লক্ষ্য হলে এই ঝুঁকি থাকবেই। কিন্তু আমার মনে হয় পদ্ধতির নিয়মগুলো ঠিকমতো অনুসরণ করলে কারও কোনো আপত্তি থাকবে না। কিন্তু আমি আপনাদের বলছি, কেউ সেই পরীক্ষা করতে যাবে না। কারণ ব্যাপারটা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য এবং প্রায় প্রতেকটি ক্ষেত্রেই এর বিকল্প আছে। বিটি এমন একটি প্রযুক্তি যা কোনো ভাবে জিএম প্রযুক্তিকে আত্মস্থ করেছে। কিন্তু জিএম প্রযুক্তির সমস্ত অসুবিধা বা অপকারিতা এই বিশেষ প্রযুক্তিতে নেই। তাহলে আমরা এই আণবিক জনন

(molecular breeding) পদ্ধতি ব্যবহার করতে যাব কেন? প্রাণী-জীবন (animal life) সম্পর্কিত এমন নতুন প্রযুক্তি তো রয়েছে যেখানে কৃষকেরাই এমন সঙ্কর (hybrid) উদ্ভিদের বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে পারে যেখানে প্রত্যেকবার সঙ্কর বীজ ব্যবহার করার সময় নতুন করে বীজ কিনে নেবার প্রয়োজন হয় না। এটা মনে রাখা দরকার যে বীজের ব্যবসা দাঁড়িয়েই আছে বিশেষ রকম সঙ্কর বীজের উপরই। যদি সেই বীজ না থাকত, তাহলে কৃষকেরা অন্যান্য সুবিধা বিন্দুমাত্র না খুইয়েই নানা প্রকারের (varieties) বীজের সৃষ্টির ব্যবস্থা করতে পারত। এই হলো আমার মতে প্রকৃত পরিপ্রেক্ষিত যা আমাদের মনে রাখতে হবে। এও ভুললে চলবে না এখন জিএম শস্যের ৮৪ শতাংশ উৎপন্ন হয় সারা পৃথিবীর মাত্র চারটি দেশে— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল। এবং এই কটি দেশে এবং বিশেষ করে কানাডাতে এমন অনেক সাক্ষ্য বা নিদর্শন আছে, যেগুলি থেকে, প্রমাণিত যদি নাও বলা যায়, অন্তত আভাসিত হয় যে, জিএম খাদ্য থেকে মানুষের স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। খাদ্যগুলি হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় জিএম সোয়া, জিএম ভুট্টা ও জিএম আলু আর ল্যাটিন আমেরিকায় জিএম সোয়া আর জিএম ধান। তাহলে এই প্রেক্ষাপটেই আমাদের দেখতে হবে জিএম সমস্যাকে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা উচিত যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য বিশ্বের নব্বই শতাংশ দেশের মধ্যে মাত্র কুড়িটি দেশ জিএম শস্য উৎপন্ন করে বা ব্যবহার করার অনুমতি দেয়। সমস্ত ইউরোপে শস্যে ছাপ-দেওয়া (Labelling) বাধ্যতামূলক। আর সেখানে কেউ ছাপ দেওয়া জিএম শস্য ব্যবহার করে না। এই ছাপ দেওয়া আর ছাপ না দেওয়াই হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন ইউরোপ আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো বিবাদের বিষয়। যুক্তরাষ্ট্রে পণ্যে ছাপ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই আর প্রযুক্তিগত ওজর দেখিয়ে সেগুলির উপর কোনো পরীক্ষাও করা হয় না। মনে রাখবেন, সারা বিশ্বে এখন এমনই পরিস্থিতি।

এ সব কথা বলর পর ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা সম্বন্ধে আমার মত আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া যাক। খাদ্য নিরাপত্তা ব্যাপারটি আসলে কী, এই প্রশ্নে আমি যা মনে করি একেবারেই শুরুতেই তা বলে নিই। যেমন আগেই অনেক নেতৃস্থানীয় মানুষেরা বলে গেছেন, বর্তমানে বিশ্বে যে পরিস্থিতি চলছে, তাতে যে দেশ খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে না, সে দেশের নিজেকে স্বাধীন ভাবা উচিত নয়। সুতরাং খাদ্য নিরাপত্তা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের দেশে ব্যাপারটি নিয়ে উদ্বিগ্ন হবার একটি বিশেষ কারণ আছে। এটা তো ঠিক ৬৪ শতাংশ ভারতীয়দের আয়ের সবটাই আসে কৃষি বা কৃষিসম্পর্কিত কাজকর্ম থেকে। আর ভারতে ১০০ জনের মধ্যে ৭০ জন গ্রামে থেকে মুখ্যত চাষবাস করেন। তাহলে খাদ্য নিরাপত্তা, ভারতের শতকরা ৬৪ জন কৃষিজীবীর নিরাপত্তা, ভারতের শতকরা ৭০ জনের বাসভূমি গ্রামীণ অংশের নিরাপত্তা এবং ভারতের কৃষিব্যবস্থার নিরাপত্তা সব একাকার হয়ে আছে। বলতে গেলে তারা সমার্থক। অন্য দেশগুলিতে অবস্থা কিন্তু মোটেই এরকম নয়। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি একশো জনে মাত্র একজনের কাজ সবার প্রয়োজনের খাদ্য ফলানো। ইউরোপে সেই অঙ্কটি হলো একশো জনে দুই আর এখানে একশো-য় চৌষট্টি। তাহলে এটা স্বীকার করতেই হবে ভারতের নিরাপত্তা বা জাতীয় নিরাপত্তার কথা বলতে গেলেই চলে আসবে খাদ্য নিরাপত্তা, গ্রামাঞ্চলের নিরাপত্তা, কৃষির নিরাপত্তা ও কৃষিজীবীর নিরাপত্তার কথা।

এবার আমি এই প্রসঙ্গে কয়েকটি নির্দিষ্ট বিচার্য বিষয়ের উল্লেখ করব।

আমাদের এটা উপলব্ধি করা উচিত যে বিশ্বে সব চেয়ে বড়ো ব্যাবসা হচ্ছে খাদ্যের ব্যাবসা। এর চেয়ে বড়ো ব্যাবসা আর নেই। খাদ্যের ব্যাবসাটি যার হাতের মুঠোয়, সে খাদ্য যারা খায় তাঁদের নিয়ন্তাও সে। অন্য ভাবে বললে, যদি কোনো দেশ, কোনো কোম্পানি বা কোনো প্রতিষ্ঠান খাদ্যের ব্যাবসাটি কব্জা করে রাখতে পারে, তাহলে তার নিয়ন্ত্রণে থাকবে সারা বিশ্ব। ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ কথাটি যেন কখনও ভুলে না যাই যে খাদ্যের নিয়ন্তাই সারা বিশ্বের নিয়ন্তা।

খাদ্যের ব্যাবসা নিয়ন্ত্রণ করতে হলে খাদ্য তৈরির দুটি মাত্র উপাদানের ব্যাবসা নিয়ন্ত্রণ করা দরকার— বীজের ব্যাবসা আর কৃষিসম্পর্কিত রাসায়নিক (agro chemical) পদার্থের ব্যবসা। যখন আমি বলছি বীজের ব্যবসা, তখন কিন্তু আসলে বলছি বিশেষ সঙ্কর বীজের কথা। কারণ আজকাল একজন কৃষককে প্রত্যেকবার বীজ বোনার সময় নতুন করে এই সঙ্কর বীজ কিনতে হয়। কারণ, একবার বীজ বপন করা হয়ে গেলে পরের বার বপনের সময় তা আর ব্যবহার করা যাবে না। বীজগুলি নানা রকমেরও নয়, কারণ বীজ বিক্রেতা কোম্পানিগুলি মোটেই বিচিত্র রকমের বীজ বিক্রি করে না। এই সব সঙ্কর বীজের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখার ক্ষমতা অর্জনের জন্য রণনীতিটা কি? সেই রণনীতির কেন্দ্রবিন্দু হলো জিএম বীজ, যার স্বত্ব তারা করায়ত্ত করেছে। আর একট ব্যাবসা যার কথা আমি আগে বলেছিলাম তা হলো কৃষিসম্পর্কিত রাসায়নিক পদার্থের ব্যাবসা— মানে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি সার, কীটনাশক আর আগাছানাশকের ব্যবসা। এর মধ্যে অবশ্যই জৈব কীটনাশক বা জৈব সার, যার মধ্যে পড়ে গোবর বা নানারকম পোকার চাষ থেকে তৈরি সার— এ সব কিছুই নেই। নিম, নিকোটিন— এ দুটিই জৈব কীটনাশক, এরকম আরও জৈব কীটনাশক আছে। প্রকৃত ঘটনা হলো, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ [ICAR, ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ] তাদের একটি প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে তাদের এমন এক ব্যবস্থা আছে, যাকে বলা যেতে পারে সুসংহত কীট ব্যবস্থাপনা [Integrated Pest Management], যার মধ্যে মিজোরামের তুলো সমেত আশিরও বেশি শস্যের জন্য জৈব কীটনাশকের ব্যবস্থা রয়েছে। যখন আমরা পেয়ে পেয়ে যাচ্ছি এমন সব প্রযুক্তি যেগুলি সুলভ, পরীক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত। যাদের আদৌ কোনো ক্ষতিকর প্রভাব নেই, তখন জিএম প্রযুক্তি ব্যবহার করার দিকে না গিয়ে এ সব প্রযুক্তি ব্যবহার করব না কেন?

আসলে সুসংহত কীট ববস্থাপনা ভারতে এসেছে সব দেশের আগে। আমরা জানি তুলোর জন্য জৈব কীটনাশক ব্যবস্থা রয়েছে। অথচ একটি মাত্র জিএম শস্য যা বাজারে এসেছে তা হলো বিটি তুলো। এই শস্যে নাকি তুলোগাছে যে সব কীট জন্মায় তার প্রতিরোধক ব্যবস্থা আছে। তাহলে যা বলছিলাম, যদি কেউ সরকারকে বুঝিয়ে শুনিয়ে রাজি করাতে পারে যাতে সরকার তাদের নিজস্ব জৈব কীটনাশক আর জৈব সার ব্যবহার না করে জিএম বীজ আর কৃত্রিম রাসায়নিক সার ব্যবহার করে, তাহলে সে বীজের ব্যাবসা আর কৃষিসম্পর্কিত রাসায়নিক পদার্থের ব্যাবসা কব্জা করে নিল। এবং এই ভাবে সে বস্তুত সারা দেশটাকেই কব্জা করে নিল। আসলে, আমাদের বিকল্পের অভাব নেই। নানা বিকল্প আছে। আমাদের প্রাকৃতিক বা জৈব কৃষিব্যবস্থা রয়েছে। আমাদের সুসংহত কীট ব্যবস্থাপনা রয়েছে। এবং এ সব শুধু কাগজে কলমে আছে তা নয়, এগুলি রীতিমতো

কার্যকর, তাও আমরা দেখিয়েছি। অন্ধ্রপ্রদেশে দু'কোটি একর জমিতে অর্গানিক চাষ হয়। এই দু'কোটি একরের মধ্যে ৫০ লক্ষ একরে কোনো কীটনাশক ব্যবহারই হয় না। এটাও দেখিয়ে দেওয়া গেছে যে জিএম শস্যের চেয়ে এতে ভালো ছাড়া খারাপ কাজ হয় না— তাও সেটা কয়েক একর জমিতে নয় কুড়ি লক্ষ একরের মতো বিস্তৃত জমিতে। এই ব্যবস্থার প্রয়োগ যদি শুধু একটি রাজ্যে সীমিত না রেখে সারা দেশে ছড়িয়ে দিই, তাহলে কারও সাধ্য নেই আমাদের কৃষি ব্যবস্থাকে এবং সেই সূত্রে সারা দেশকে নিয়ন্ত্রিত করে। আমাদের দেশে কৃষকদের অধিকার স্বীকৃত এবং তার সুরক্ষার জন্য আইনও আছে। আইনেই আছে বীজের ক্ষেত্রে কী কী ব্যবহার করা যেতে পারে আর কী কী করা যায় না। সুতরাং— আমরা যদি বিশেষ সঙ্কর বীজের বদলে নানারকম বীজ ব্যবহার করি তাহলে কোনো কোম্পানিই বীজের ব্যবসায়ে তেমন মুনাফা করতে পারে না। কারণ সেক্ষেত্রে কৃষক যেখান থেকেই বীজ কিনুক, সে বীজ আবার ব্যবহার করতে পারে। নানা প্রকারের বীজের ব্যবহারে কোনো আইনি বাধাও নেই। এ সব জানার পর এই প্রশ্নটি করতে ইচ্ছে হবেই, তাহলে বাস্তবে এ সব কিছু ঘটছে না কেন? আমরা যা দেখতে পাচ্ছি, তার ভিত্তিতে উত্তরটি হলো এই---একদিকে বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলি আর অন্যদিকে ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ— এদের মধ্যে ভালোরকমের যোগসাজস রয়েছে। তাই আমাদের দেশে বিকল্প ব্যবস্থার অস্তিত্ব আছে কিন্তু ব্যবহার নেই।

আমাদের এটা স্বীকার করতেই হবে যে, ভারত হচ্ছে বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম সম্ভাব্য বাজার। শুধু তাই নয় ভারতে রয়েছে ইতিহাস, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, প্রশিক্ষিত ও নবীন জনশক্তি— এককথায় এক অপরিমেয় সম্ভাবনা। ভারতের সম্পদ একেবারে আক্ষরিক অর্থেই তুলনাবিহীন। বিশ্বাস করুন, পৃথিবীতে আর কোনো দেশ নেই যার ঐতিহাসিক, প্রাকৃতিক আর মানব সম্পদ ভারতের চেয়ে বেশি। আমাদের দেশে স্বাধীনতার পর দশটি প্রধান বিপ্লব হয়ে গেছে। আপনারা বলতে পারেন সবুজ বিপ্লবের কথা, তাতে অবশ্য অনেক সমস্যাও ছিল। আমাদের দেশে হয়েছে শ্বেত বিপ্লব, দুধ উৎপাদনে এই দেশ এখন বিশ্বে প্রথম। তারপর হয়েছে মহাশূন্য বিপ্লব, ডিএনএ প্রযুক্তি বিপ্লব, তথ্য প্রযুক্তি [IT] বিপ্লব, ওষুধ বিপ্লব। আমাদের আছে প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি বিপ্লব, সঞ্চারণ [communication] বিপ্লব। যদি কেউ অন্য কোনো দেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, তাহলে সে ভারতকেই বেছে নেবে— কারণ অবশ্যই তার নানা সম্পদ, যে কথা এখনই বললাম।

উপনিবেশবাদের অন্তর্ধানের পর বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে একটা ইচ্ছে জেগে উঠল অন্য দেশ নিয়ন্ত্রণ করে, তার সম্পদগুলি নিজেদের কাজে ব্যবহার করার। এমন একটি রাস্তার ছক কষার কাজ চলল নানা দেশের মধ্যে, যাদের মধ্যে অগ্রণী হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এ কথার প্রমাণ কি? তাই যদি না হয়, তাহলে কি আমরা ভিয়েতনামের যুদ্ধ দেখতাম? দেখতাম সুয়েজ সঙ্কট? পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েট নিয়ন্ত্রণ? আমরা কি দেখতাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক আক্রমণ? আজ এটা ঘটনা— একটি দেশ সারা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করার মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে— সেটি হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র— কারণ তো আমি আগেই জানিয়েছি। আর এটা ভুললেও চলবে না যে বহুজাতিক সংস্থাগুলি জিএম প্রযুক্তি বিক্রি করতে তাদের ঘাঁটি গেড়েছে, পুরোপুরি না হলেও মুখ্যত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তাহলে সারা বিশ্বের নিয়ন্তা হবার জন্য যুক্তরাষ্ট্র কী করছে এখন?

কায়দাটা একমুখী নয় বহুমুখী। এই সব অভিমুখের দু একটি উপাদানের কথা জানিয়ে রাখি। প্রথম উপাদানটি গোপন মেধাসম্পদের স্বত্বের (talent intellectual property rights) বাণিজ্য। এ ব্যাপারটা ছিল পুরোপুরি একপেশে, এটা তৈরি হয়েছিল বিকাশশীল দেশের সম্পদের রদবদল করে বা তাদের ভাষায় বিকাশ ঘটিয়ে আত্মসাৎ করার উদ্দেশে। মজার ব্যাপার হলো এই, এ চুক্তিতে বেশ কয়েকটি ধারা আছে যেমন ৭, ৮, ২৭.২ যার সহায়তায় আমাদের ওপর যে সব সীমাবদ্ধতা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে সেগুলোকে খারিজ করে দেওয়া যায়। সরকার কেন সেই সব ধারা ব্যবহার করছে না? আগেই বলেছি,এগুলোই হচ্ছে পৃথিবীটাকে নিজের কবজায় আনার উপায়। আরও শুনুন, যে সব কোম্পানি জিএম বীজ বিক্রি করে, তারাই বিক্রি করে কৃত্রিম রাসায়নিক সার। যে সমস্ত প্রধান কোম্পানির হাতে বিশ্বের ৯০ শতাংশ বীজ, তারাই বিশ্বের কৃষি সম্পর্কিত রাসায়নিক পদার্থের ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ তৈরি করছে। যে ব্যাপারটা আমার সবচেয়ে বেশি উদ্বেগের কারণ লাগে, তা হলো আজকের তথ্যঅনুযায়ী ভারতের বীজ ব্যবসায়ে ৩০ শতাংশের মালিক হলো বহুজাতিক কোম্পানিগুলি (MNCs)। এটি ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ (ভারতীয় কৃষি গবেষণা পর্ষদ)-এর তথ্য যা আছে আমার কাছে। বিশ্বের বৃহত্তম কোম্পানিগুলোর একটি হচ্ছে মাহিকো নামে এক ভারতীয় কোম্পানি। কিন্তু যদি অনুমতি করেন তো বলি, এই তথ্যটি বাস্তবের ধারেকাছেও নেই। মনসান্টোর ২৬ শতাংশ শেয়ার আছে মাহিকোতে। আর যদি আপনি কোনো কোম্পানির ২৬ শতাংশ শেয়ারের মালিক হন, তাহলে আপনার হাতে 'ভেটো' প্রয়োগ করবার অধিকার এসে গেল, তার মানে আপনি কোম্পানিটি নিয়ন্ত্রণ করছেন। আমাদের বীজ ব্যবসায়ের ৩০ শতাংশ বহুজাতিক সংস্থার দখলে থাকাটা এজন্যই গভীর দুশ্চিন্তার কারণ। এ সব কোম্পানির কথা যখন সাধারণ ভাবে বলছি, তখন একটা উদাহরণ দেওয়া মনে হয় ঠিক হবে। আমার ইচ্ছে করছে মনসান্টোর উদাহরণটা সামনে রাখতে। ভারতে যে সব বহুজাতিক কোম্পানি কাজ করছে তাদের মধ্যে মনসান্টো হলো সবচেয়ে বড়ো আর সবচেয়ে প্রভাবশালী। তাহলে ঘটনাটা দাঁড়াল এইরকম। এই ভারতে আছে মনসান্টো, আর আছে মাহিকো যার ২৬ শতাংশ শেয়ারের মালিক হলো মনসান্টো। তা ছাড়া আছে মনসান্টো-মাহিকো যার ৫৫ শতাংশ শেয়ারের মালিক মনসান্টো আর বাকি ৪৫ শতাংশ মাহিকোর। আরও জেনে নেওয়া দরকার, বহুজাতিক কোম্পানিগুলির মধ্যে মনসান্টো হচ্ছে সবচেয়ে বেশি বিবেকহীন ও নীতিজ্ঞানবর্জিত। সমস্ত বহুজাতিক কোম্পানিই দুর্নীতিগ্রস্ত কিন্তু মনসান্টো এক্ষেত্রে তাদের সব কীর্তিকে ম্লান করে দিয়েছে।

এবার মনসান্টোর অসাধুতার কিছু সাক্ষ্য প্রমাণ দিতে চাই। মনসান্টোর মিথ্যার পরে মিথ্যা বলবার, এবং তথ্যে কারচুপি করবার বহু নজির আছে। বহু বেআইনি কাজে মনসান্টো লিপ্ত হয়েছে। ভারতেও তার অবৈধ কার্যকলাপ অসংখ্য। বিটি তুলোকে GEAC (জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্রাইজাল কমিটি) অনুমোদন দেবার আগেই ভারতে এটা চালু করবার চেষ্টা করেছিল এই কোম্পানি। এই তথ্য প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাব নেই। এই তো কিছুদিন আগেই, মনে হয় গত মাসেই (জুলাই ২০১২) ব্রাজিল সরকার, (আগেই বলেছি, বিশ্বের জিএম প্রযুক্তি ব্যবহারকারী চারটি দেশের একটি ব্রাজিল), মনসান্টোকে ৬.২ বিলিয়ন ডলার জরিমানা করেছে

রয়ালটি বাবদ টাকা দাবি করার জন্য। মানুষের ও প্রাণীর স্বাস্থ্য ও জীববৈচিত্র্য সম্বন্ধে প্রকাশিত সমস্ত তথ্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে মনসান্টো। অতীতে এই মনসান্টো বিপুল দূষণ ঘটিয়েছে। ভিয়েতনামের যুদ্ধের সময় এর একটি কদর্য ভূমিকা ছিল। এখন সেখানে ২০০ একর জমিতে একটি পাতাও চোখে পড়বে না। ভারতে এরা এমন কীটনাশকের বিপণন করে যা অন্য কোথাও করা হয় না। আসলে ভিয়েতনামেই এদের ১৮০ মিলিয়ন ডলার খেসারত দিতে হয়েছে মিটমাট করার জন্য। এদের ঘুষ দেবার কথা তো অনেকেরই জানা। ইন্দোনেশিয়াতে ১৪০ জনেরও বেশি সরকারি কর্মকর্তা মনসান্টোর থেকে ঘুষ খেতে গিয়ে ধরা পড়েছে। এমন কি মনসান্টোর বড়ো সমর্থক যুক্তরাষ্ট্র সরকারও মনসান্টোকে জরিমানা করতে বাধ্য হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন জায়গায় অত্যন্ত ক্ষতিকর পদার্থ বোঝাই করে রাখার জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল এই কোম্পানি। মনসান্টোকে এখন যুক্তরাষ্ট্রের গমের বদলে ভুট্টার ব্যবসা করতে বলা হচ্ছে, কারণ গমে সাধারণত জিনগত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়নি অথচ ভুট্টাতে ব্যবহার করা হয়। এ কাজ খাদ্যের পুষ্টির দিক থেকে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মনসান্টোর অশুভ যোগসূত্রের সাক্ষ্য প্রমাণের কোনো অভাব নেই। আমাদের কাছে এমন প্রমাণযুক্ত নথিপত্র রয়েছে। ধরুন, কোনো শুক্রবার মনসান্টো এফডিএ-র [FDA] কাছে কোনো ব্যাপারে অনুমতি চেয়ে দরখাস্ত করল। সোমবার দেখা গেল যিনি মনসান্টোর নামে আবেদনপত্রটি দাখিল করেছেন, তিনি নিজেই এফডিএ-তে এই ধরনের আবেদনপত্র পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। তিনি আবেদনপত্রটি দিব্যি অনুমোদন করে দিলেন। ভাবুন একবার। আমি এমন একটি ব্যাপার উল্লেখ করলাম এই কারণে যে এটি কোনো গোপন তথ্য নয় এগুলি নিয়ে প্রকাশ্য বিতর্ক চলছে। আর আমরা যখন জানি যে, ভারতে জিএম শস্য পুরোপুরি নাহলেও মুখ্যত মনসান্টোর থেকে পাওয়া— ভারতের নব্বই শতাংশ জিএম শস্য হলো মনসান্টোর— তাহলে এমন একটি কোম্পানিকে আমরা ভারতে থাকতে দিচ্ছি কেন? কী করে? আর যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মনসান্টোর অশুভ যোগসূত্র টিকে থাকে সে কথা বলা যাক।

জিএম শস্যের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রে কোনো নিয়মকানুন নেই, বলতে গেলে বিষয়টি প্রায় পুরোপুরিই অনিয়ন্ত্রিত। ওখানে শুধু এটিই দেখাতে হয় যে বস্তুটি আসল বস্তুর [Prototype] সঙ্গে অভিন্ন। জমিতে বিটি শস্য চালু করা এদেশে এখনও অনুমোদন পায়নি। কিন্তু এ ধরনের শস্যের দীর্ঘমেয়াদি পরিণাম সম্পর্কে আমেরিকায়, ভারতে, বা অন্য কোনো দেশে কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়নি। তাহলে এ প্রশ্ন করাও যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক— আমরাই বা এ সব বস্তুর ব্যবহারের দীর্ঘ মেয়াদি ফল জেনে নেবার কোনো চেষ্টা করলাম না কেন? জনসাধারণের সুবিধার জন্য একটি পদ্ধতি অন্য দেশের সঙ্গে ভারতেও চালু আছে যাকে বলা হয় জিএম বস্তুর চিহ্নিতকরণ বা ছাপ দেওয়া [labelling]। দোকানে বহু জিএম ফসল বা উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রি হয়। যদি আপনি কোনো ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে (বিভিন্ন জিনিস বিক্রির বড়ো দোকান বা বিভাগীয় বিপণী) যান এবং কোনো জিনিস দেখেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৈরি আর যদি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হন তাতে কিছু পরিমাণ সোয়া রয়েছে, তাহলে বুঝবেন এটি জিএম শস্য কারণ যুক্তরাষ্ট্রে বপন করা প্রায় সব সোয়াই জিএম। আমরা শোধিত তুলো বীজের তেল [refined cotton seed oil] ব্যবহার করি, আর ভারতে বপন করা তুলোর বীজের ৯০ শতাংশ হচ্ছে জিএম। তাহলে বিটি তুলোর বীজ থেকে শোধিত তেল আমাদের সরকারের অনুমোদন পেয়েছে, এর কোনো মানে হয়? সম্প্রতি ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি প্রস্তাব যার নাম প্রস্তাব ৩৭ এবং আরও কয়েকটি প্রস্তাব আনা হয়েছিল, জিএম খাদ্যবস্তুর ছাপ দেওয়া বা লেবেল করার পক্ষে জনমত যাচাই করার জন্য। সমীক্ষার শেষে দেখা গেল ষাট শতাংশ মানুষ লেবেল করার পক্ষে। কিন্তু সরকার তা কখনও চান না। ক্যালিফোর্নিয়ায় জিএম শস্যের বিপক্ষে প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল। এই প্রতিরোধ সারা বিশ্বে চলছে। আর এই প্রতিরোধের জন্যই আমাদের যুদ্ধ। আসলে আমরা মনসান্টোর মতো কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি। ভারত সরকার যার মানে হলো ভারতের রাজনৈতিক লোকজন আর আমলারা মনসান্টোর মতো কোম্পানিগুলির সঙ্গে এক অশুভ বোঝাপড়ার বন্ধনে আবদ্ধ। এই অশুভ যোগসূত্রই নিয়ে চলে এমন অবস্থার দিকে যেখানে এমন কাজই করা হবে যা এ-ধরনের মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মনঃপূত। সে কাজের ফলে জনসাধারণের বাকি বিরাট অংশের কী হল না হলো তাতে তাদের কিছুই আসে যায় না। এটাই হলো আমাদের অন্যতম প্রধান দুশ্চিন্তার বিষয়।

যাতে জিএম শস্য আমাদের কৃষি ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অংশ না হয়ে উঠতে পারে সে জন্য আমার মতে, কী কী করা দরকার, সে বিষয়ে কিছু বলেই আমার কথা শেষ করতে চাই। প্রথম, বিটি বেগুনকে বাজারে ছাড়ার ব্যাপারটির উপর কড়া নজর অব্যাহত রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত, এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা ছড়িয়ে দিয়ে হবে অন্য সব কটি নতুন শস্যের ক্ষেত্রে— কোনোরকম ছাড়াছাড়ি চলবে না এ বিষয়ে। তৃতীয়ত জিএম শস্য পরীক্ষার জন্য আমাদের নিজস্ব পরীক্ষাগার [laboratory] থাকা দরকার, অবশ্য যদি এই পরীক্ষার প্রয়োজন হয়। যদি দেখা যায় এর একটি আর্থ-সামাজিক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং যদি এমনই ঘটনা ঘটে যে আমাদের সামনে অন্য কোনো বিকল্প নেই। তাহলে তো আমাদের অবশ্যই প্রয়োজন নিজস্ব ল্যাবরেটরির, যেখানে আমরা পরীক্ষা করতে পারব দোকানের তাকে যে খাদ্যবস্তুটি রাখা হয়েছে সেটি জিনগত ভাবে পরিবর্তিত বা জিএম কি না। এ জন্য ৩০ রকম পরীক্ষা ঠিকমতো করার পর অনুমোদন করতে করতে বছর কুড়ি লেগে যাবে। সত্যিই অবাক হতে হয় এই ভেবে যে ভারতের মতো একটি দেশে একটিও ল্যাবরেটরি নেই যেখানে আমি একটা নমুনা পাঠিয়ে প্রশ্ন করতে পারি তার মধ্যে পরিবর্তিত জিন বা কোনো বহিরাগত জিন ঢুকে আছে কি না। সুপ্রিম কোর্ট থেকে যখন আমাকে জিনেটিক এঞ্জেনিয়ারিং এ্যাপ্রাইজাল কমিটির (জিন প্রযুক্তি যাচাই সমিতি) সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হয়, তখন আমি একটি গবেষণাগারের বিশদ পরিকল্পনা [blue print] জমা দিয়েছিলাম তাদের কাছে। এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যাপারে আমার নিজস্ব কিছু অভিজ্ঞতাও আছে। একটি দেশে এমন একটি ল্যাবরেটরি থাকা উচিত। কিন্তু সরকার ইচ্ছে করেই এটি তৈরি করছেন না। আমাদের এমন ল্যাবরেটরি থাকলে আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা জিনিসপত্র পরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়ে দিতাম—কিন্তু তাতে তাদের ব্যবসায় বড়ো বেশি লোকসান হয়ে যেত। লেবেল করার দরুন লোকসান তো হবেই। কেন লোকসান? কারণ আপনি যদি এক মাঠে বিটি তুলোর আর পাশের মাঠে জৈব [organic] তুলোর চাষ করেন তাহলে পাশের মাঠে যদি বিটি তুলোর সংক্রমণ বা দূষণ

হয়ে যায়, তাহলে আপনি তো আর সে তুলো জৈব তুলো হিসেবে বেচতে পারছেন না। জৈব হিসেবে বেচলে আপনি বেশি দাম পেতেন। বিটি তুলো বেচে তো তা পাবেন না। তাহলে এই লোকসানের টাকা মিটিয়ে দেবে কে? আমাদের এখানে তো লোকসানের দায়ের ব্যাপার নেই, তাই যা খুশি তাই চলছে এখানে। আমাদের চাই এমন একটি বলিষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যা রাষ্ট্রীয় [Public] বা বেসরকারি [Private] ক্ষেত্রের হস্তক্ষেপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আমাদের কিছুতেই বীজের ব্যবসায় বিদেশী পুঁজির প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ [Foreign Direct Investment : FDI] চলতে দেওয়া উচিত নয়। বীজের ব্যাবসা-র রাষ্ট্রীয়করণ করা দরকার। জাতীয় বীজ নিগমের (ন্যাশনাল সিড কর্পোরেশান) ভাণ্ডার শূন্য করা হলো কেন? বীজগুলি ঠিক না বেঠিক তা পরীক্ষা করার জন্য ল্যাবরেটরি নেই কেন? পরীক্ষা তো দূরের কথা, ভারতে দশ বছরের বিটি তুলো চাষের বিষয়ে সরকারি স্তরে একটি যথার্থ পর্যালোচনা পর্যন্ত আমরা করে উঠতে পারিনি। কাউন্সিল অফ সোশ্যাল ডেভেলপমেন্টের (সামাজিক বিকাশ পর্ষদ) উদ্যোগে গত মাসে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত একটি সভায় এ বিষয়ে একটি সমীক্ষার প্রতিবেদন পেশ করা হয়। কী জানা গেল সমীক্ষার ফলাফল থেকে? ফলাফল হলো এই, বিটি তুলো মোটামুটি কাজ করেছে সেচ-এলাকাভুক্ত জমিতে, তা হলো তুলো চাষ করা হয় এমন জমির এক-তৃতীয়াংশ। বাকি দুই-তৃতীয়াংশ জমি যেখানে জলসেচ ছাড়াই তুলো চাষ হয়, সেখানে বিটি তুলোর চাষ মোটেই সফল হয়নি। কৃষক আত্মহত্যার হার সেখানেই বেশি কারণ অনেক কৃষক ঋণের ভারে জর্জরিত হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। নরেন্দ্র সাক্সেনা তাঁর (তথ্যচিত্রে) বিটি তুলো চাষ যে এলাকায় হয়েছিল সেখানকার কৃষকদের আত্মহত্যার এক দলিল তুলে ধরেছেন। এ বিষয়ে এটিই প্রথম তথ্যচিত্র। আমাদের দেশে কাজকর্মের উপর নজর রাখার জন্য কোনো সুসংবদ্ধ ব্যবস্থা নেই, তাই বিটি তুলোকে বাইরে ছাড়ার পরও কোনোরকম নজর রাখা হয়নি। একটি ওষুধ বাজারে ছাড়বার আগে অবশ্যই সেই ওষুধকে পরীক্ষা করা এবং ফলাফল পর্যবেক্ষণ করার পর্যায় চলে। এ সব কিছুই হয়নি।

আমি শেষ করবার আগে একথা আবার উল্লেখ করব যে, জিএম শস্যের বিষয়টি ভারতের খাদ্য নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত। আমি যে সব পদক্ষেপের কথা সংক্ষেপে বলেছি তার প্রতিটি পদক্ষেপ সরকারকে অবশ্যই নিতে হবে। সরকার যদি নিজে থেকে এ কাজ না করে, তাহলে আমাদের সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। এই সমস্ত পদক্ষেপের মধ্যে যেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো এই বীজের ব্যাবসাতে বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ অনুমোদন বন্ধ করা। আর সেজন্যই মনসান্টো এবং অন্য যে সব বিদেশী কোম্পানি এই ব্যাবসাতে ঢোকার চেষ্টা করছে তাদের দেশ থেকে দূর করে দেওয়া। আমি মনে করি যদি আমরা এই প্রয়োজনীয় প্রয়াসে ব্রতী হই, তবে সাফল্য আসবেই। মনে রাখবেন বিটি বেগুনকে ছেড়ে দেবার ব্যাপারটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখার নির্দেশ আদায় করতে আমরা সফল হয়েছি। এটিই হচ্ছে স্বাধীনতার পর ভারতে নাগরিক সমাজের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। আমরা সফল হয়েছি, কারণ জনসাধারণ এর বিরোধিতা করেছিলেন এবং আমরা এক হয়েছিলাম। ২০০৯-১০ সালে এই একটি বিশেষ বিষয়ে জনসাধারণের সমন্বিত কর্মকাণ্ডের জাল ছড়িয়ে পড়েছিল সারা দেশ জুড়ে।

তাই আমার সুনির্দিষ্ট মত হলো কৃষি-সুরক্ষার জন্য বীজের ক্ষেত্রে কোনো বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ আমাদের কিছুতেই মেনে নেওয়া চলবে না।.... আসুন আমরা এই আশা ব্যক্ত করি— লক্ষ্য পূরণের জন্য আমরা আবার এক হতে পারব। □

উনিশ শতকের বাংলার চাষি : এক অক্ষয় আর্কিটাইপ

২০ পাতার পর

চাষি-র অনুবাদক মন্মথ নাথ সরকার। শেষোক্ত অনুবাদটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৩ সালে। এর ভূমিকা ছাপা হয় 'গ্রন্থকার' নামে। স্পষ্ট উল্লেখ করা আছে তাতে যে এটি *বেঙ্গল পিজান্ট লাইফে*-র অনুবাদ। যারা অনুবাদ করেন তারা জানেন দুটি অনুবাদ, এমনকি একই বই একজন অনুবাদক আলাদা ভাবে দ্বিতীয় বার করলেও কখনই হুবহু মেলে না। অথচ *বাংলার চাষি* এবং *গোবিন্দ সামন্ত* পাশাপাশি ফেলে দেখি অনূদিত দুটি বই হবহু এক। দেবীপদ ভট্টাচার্য লালবিহারী দে-র উপর গবেষণা করেছেন। তাঁরই তত্ত্বাবধানে অনুবাদকের নাম ছাড়াই *গোবিন্দ সামন্ত* প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল মণীষা গ্রন্থালয় থেকে ১৯৬৭ সালে অর্থাৎ মন্মথ নাথের অনুবাদের ১৪ বছর পরে। ২০১৩ সালে সেরিবান সংস্করণে প্রকাশকের তরফ থেকে অনেক প্রশ্ন-ট্রশ্ন তুলে দেবীপদ ভট্টাচার্যকে অনুবাদক ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে। আশ্চর্যের এই যে, লালবিহারী গবেষক দেবীপদবাবু বহু তথ্য খুঁজে বার করেছেন এমনকি প্রথম অনুবাদক সত্যবাদী ঘোষালের নাম এবং লেখকের জীবদ্দশায় কোনো এক শিবচন্দ্র মুখার্জি অনুবাদে অগ্রসর হন, তারও উল্লেখ করেছেন অথচ 'শিক্ষাসত্র' থেকে প্রকাশিত *বাংলার চাষি*-র মন্মথ নাথের অনুবাদের কথা কখনও শোনেন নি! তাঁর *রেভারেন্ড লালবিহারী দে ও চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান* কিংবা *গোবিন্দ সামন্ত* কোথাওই এর কোনো উল্লেখ নেই। অন্যদিকে মন্মথ নাথও লালবিহারীর জীবদ্দশায় হওয়া প্রথম অনুবাদকের নাম কোথাও করেন নি! কিমাশ্চর্যম!

টী কা

১. টেকচাঁদ ঠাকুরের (প্যারীচাঁদ মিত্র) *আলালের ঘরের দুলাল*-এর সঙ্গে এর অন্তর্নিহিত মিল হলো, কোনোটিই তথাকথিত রোমান্সধর্মী নয়।

২. *ফোক টেলস অফ বেঙ্গল* ধারাবাহিক ভাবে প্রথম প্রকাশিত হয় *বেঙ্গল ম্যাগাজিনে*, ১৮৭৫-এ।

৩. এই কাহিনী পড়ে, বিখ্যাত বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন প্রকাশক ম্যাকমিলনকে ১৮৮১-র ১৮ এপ্রিল একটি চিঠিতে লিখেছিলেন: I see that the Rev Lal Behari Day is Editor of the 'Bengal Magazine' and I shall be glad if you would tell him with my compliments how much pleasure and instruction I derived from reading, a few years ago, how his novel, Gobinda Samanta.'

৩ সে কালের জমিদাররা রায়তদের উপর কি ধরণের শারীরিক নির্যাতন চালাতো তার একটা দীর্ঘ তালিকা *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-য় প্রকাশিত হয়েছিল। বিনয় ঘোষের *সাময়িকপত্রে বাঙলার সমাজচিত্র* থেকে বদরুদ্দীন উমর সেটি *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলার কৃষক* (পৃ. ৩৩)-এ উদ্‌ধৃত করেছেন।

উল্লেখ ছাড়াও অন্যান্য সাহায্যকারী সূত্র (সংক্ষিপ্ত)

১. পরিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, *ভূমি ও ভূমি সংস্কার সেকাল একাল*, দে'জ, কলকাতা, ২০০৭।

২. দেবীপদ ভট্টাচার্য, *রেভারেন্ড লালবিহারী দে ও চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান*, প ব বাংলা আকাডেমি, কলকাতা, ২০০১।

৩. সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, ১ম খণ্ড, বিদ্যোদয়, কলকাতা, ১৯৬৬।

৪. বিনয় ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা, ১৯৭৩।

৫. আর পাম দত্ত, ইন্ডিয়া টুডে, মণীষা, কলকাতা, ১৯৬৬।

নতুন পোপ নির্বাচন : ধর্মতত্ত্ব না রাজনীতি?

সিদ্ধার্থ গুপ্ত

'হেবেমাস পাপাপ'। সাদা ধোঁয়া বেরিয়ে এসেছে সিস্টিন চ্যাপেলের চিমনি থেকে। নির্বাচিত হয়েছেন পরবর্তী পোপ।

'ডিভা ইল পাপা' (পোপের জয় হোক) ধ্বনিতে ভরে গেছে গোটা সেন্ট পিটার্স চত্বর। বাজছে ঘণ্টা। বাজছে ইতালির জাতীয় সংগীত 'ইল কান্তো দেগিল ইতলিয়নি'। একটু পরেই ভ্যাটিক্যানের বারান্দায় এসে কার্ডিনালদের ঘোষণা— পোপ নির্বাচিত হয়েছেন।

নতুন পোপের নির্বাচন বহুদিক থেকেই ব্যতিক্রমী। প্রথমে স্বাস্থ্যের কারণে পূর্ববর্তী পোপ অস্ট্রিয়ার জোসেফ রাৎজিঙ্গার বা ষোড়শ বেনেডিক্টের পদত্যাগ— যা ভ্যাটিকানের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। আগের কোনো পোপই এ ভাবে পদত্যাগ করেননি। দ্বিতীয়ত এই প্রথম ইউরোপীয় ভূখণ্ডের বাইরে লাতিন আমেরিকা থেকে পোপ নির্বাচিত হলেন জর্জ বার্গোগ্লিও বা পোপ ফ্রান্সিস-১। তৃতীয়ত, পোপ নির্বাচনের জন্য পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্ত থেকে আসা কার্ডিনালদের এই মহাসম্মিলন বা 'পাপাল কনক্লেভ' সেন্ট পিটার্স ব্যালিনিকায় শেষ হয়ে গেল মাত্র দুইদিনে।

১৯৭৮ সাল পর্যন্ত সব পোপই নির্বাচিত হয়েছেন ইতালি থেকে। ১৯৭৮ সালে পোলান্ডের দ্বিতীয় জন পল প্রথম অ-ইতালীয় পোপ। তিনি নির্বাচিত হন আটদফা ভোটাভুটির পর। পোপ ফ্রান্সিস এর নির্বাচন হলো অনেক দ্রুত, মাত্র পাঁচ রাউন্ডের পরই। পৃথিবীর ১১৫ জন কার্ডিনালের (এর মধ্যে ভারতের তিরুবনন্তপুরমের আর্চবিশপ ক্লিমিস থোট্টুফানও ছিলেন) প্রতিনিধি হিসাবে ফরাসি কার্ডিনাল জাঁ লুই তরান এই নতুন নির্বাচনের কথা লক্ষাধিক ভক্তের সামনে ঘোষণা করলেন। আগে মনে করা হয়েছিল মিলানের আর্চবিশপ কার্ডিনাল অ্যাঞ্জেলো স্কোলারই সম্ভাব্য পোপ। কিন্তু বুনেরস আয়ার্স-এর আর্চবিশপ বার্গোগ্লিওই শেষ পর্যন্ত প্রথম অ-ইউরোপীয় পোপ হলেন ভ্যাটিকানের প্রায় পাঁচশো বছরের ইতিহাসে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সারা দুনিয়ার ১২০ কোটি ক্যাথলিকের মধ্যে চল্লিশ কোটিরও বেশি থাকেন ইউরোপের বাইরে— লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়াতে। তাই ক্যাথলিক চার্চের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই কার্ডিনালদের এই নির্বাচন। প্রথমে ইতালীয় ও পরে ইউরোপীয় জাত্যভিমান দূরে সরিয়ে রেখে 'যজমান'দের প্রত্যাশা পূরণের চেষ্টা। দক্ষিণের ইভানজেলিক্যাল চার্চগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা তীব্রতর। যৌন নিগ্রহ সংক্রান্ত সংকটে পাশ্চাত্যে ক্যাথলিক চার্চের নৈতিক আধিপত্যের অবমূল্যায়ন, খোদ ভ্যাটিক্যানে প্রশাসনিক দ্বন্দ্ব। এই সব কাটিয়ে উঠতেই একদা মহাপরাক্রমশালী ভ্যাটিকানের সর্বোচ্চ আসনে 'অন্যরকম পোপ' ক্রমিক সংখ্যা হিসাবে যিনি ২৬৬তম।

ব্যতিক্রমী নির্বাচন

৭৬ বছরের জর্জ মারিও বার্গোগ্লিওর নির্বাচন আরও একদিক থেকে চূড়ান্ত ব্যতিক্রমী। ইনিই হলেন বিশ্বের প্রথম 'জেসুইট' পোপ। জেসুইট বা 'সোসাইটি অফ জেসাস' হলো খ্রিস্টের উপাসকদের একটি স্বতন্ত্র ধারা। এই জেসুইট ধারার প্রতিষ্ঠাতা হলেন সেন্ট ইগনিসিয়াস (St Ignatius of Loyola)। স্পেনের বাস্ক উপজাতির এই প্রাক্তন সৈনিক যুদ্ধে গুরুতর আহত হন। ১৫২১ সালে ফরাসি সৈন্যবাহিনীর সাথে যুদ্ধে কামানের গোলায় তাঁর একটি পা উড়ে যায়। হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে তিনি গভীর ভাবে আকৃষ্ট হন প্রভু যিশুর জীবন ও আদর্শের প্রতি। যুদ্ধ এবং মানুষে-মানুষে হানাহানির প্রতি তাঁর তীব্র বিতৃষ্ণা জন্মায়। দশবছর ধর্মীয় জীবন কাটানোর পর ১৫৪০ সালে সম-মতালম্বীদের নিয়ে তিনি গঠন করেন 'সোসাইটি অফ জেসাস' বা জেসুইট সম্প্রদায়ের। ১৬২২ সালে পোপ পঞ্চদশ জর্জ এঁদের স্বীকৃতি দেন।

প্রথাগত ভাবে জেসুইটরা ভ্যাটিকানে উচ্চপদ গ্রহণ করতেন না। শিক্ষার প্রসার বা অন্যান্য সেবামূলক কাজে নিজেদের ব্যস্ত রাখতেন। ইউরোপের বাইরে তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে ধর্মপ্রচারের জন্য ছড়িয়ে পড়া এবং প্রোটেস্টান্টদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব খর্ব করার ক্ষেত্রে জেসুইটরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ষোড়শ শতক থেকে জাপান, চিন, ভারত ও উত্তর আমেরিকাতে তাঁরা দলে দলে গিয়ে বহু অ-খ্রিস্টানকে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করেন। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ইউরোপীয় দেশগুলির উপনিবেশ বিস্তারের নীতি ছিল 'এক হাতে তরবারি, অন্য হাতে বাইবেল।' এই নীতি কার্যে পরিণত করার ক্ষেত্রে জেসুইটদের অবদান উল্লেখযোগ্য। ধর্মপ্রচারের জন্য বলপ্রয়োগ, সংঘর্ষ, 'হিদেন'দের বসতিতে অগ্নিসংযোগ এই সবেরও বহু অভিযোগ রয়েছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়।

জেসুইটদের সঙ্গে অবশ্য ভ্যাটিকানের বহু দ্বন্দ্ব ছিল। ১৭৭৩ সালে পোপ ষোড়শ ক্লেমেন্ট (Pope Clement 16th) জেসুইটদের শাস্তি দেবার জন্য এবং প্রয়োজনে গ্রেপ্তার করে কারাগারে নিক্ষেপ করতে হবে বলে এক ডিক্রি জারি করেন সমস্ত খ্রিস্টধর্মাবলম্বী দেশ ও তাদের অধিকৃত বিভিন্ন উপনিবেশে। নানা বিষয়ে উদার মনোভাব বা অন্যান্য উপনিবেশে বিশেষত লাতিন আমেরিকায় ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের (colonisers) স্বার্থের বিরুদ্ধে স্থানীয় অধিবাসীদের পক্ষে দাঁড়ানো চার্চের কাছে গুরুতর অপরাধ বলে মনে হয়েছিল। রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী ক্যাথরিন দ্য গ্রেট কেবল পোপের এই ডিক্রিকে কোনো গুরুত্ব দেননি। তাছাড়া আর প্রায় সর্বত্রই ওই ডিক্রি-বলে বহু সংখ্যক জেসুইট পাদ্রীকে বিতাড়ন অথবা গ্রেপ্তার করা হয়। জেসুইটদের পরিচালিত বিদ্যালয়, অনাথ আশ্রম

প্রভৃতি চার্চ মনোনীত বিশপরা নিয়ে নেন। চার দশক পরে ১৮১৩ সালে পোপ সপ্তম পিয়াস (Pope Pius VII) জেসুইটদের পুনর্বাসন দেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও পরবর্তীকালে গর্ভপাত, জন্মনিয়ন্ত্রণ, মহিলাদের অধিকার, সমকামিতা, সমকামী দম্পতির সন্তান দত্তক নেওয়া এবং রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে নানা গণআন্দোলনকে সমর্থন করার মতো বিষয় নিয়ে রক্ষণশীল ভ্যাটিক্যান ও আপাত উদারনৈতিক জেসুইটদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলেছে। এর মধ্যে অন্যতম প্রধান হলো দক্ষিণ আমেরিকার দেশে দেশে একনায়কত্ব ও সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে বামপন্থী গেরিলাদের সংগ্রামে লিবারাল থিওলজিস্টদের (Liberal Theologist) ভূমিকা। এ বিষয়ে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করব।

মূলত ইংল্যান্ড ও বেলজিয়াম থেকে জেসুইট পাদরিরা প্রায় ২০০ বছর আগে বাঙলায় আসেন এবং বহু প্রান্তিক গ্রামে গিয়ে স্কুল, দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র, হাসপাতাল ইত্যাদি তৈরি করেন। উত্তর-পূর্ব ভারতেও বিস্তীর্ণ এলাকায় শিক্ষার আলো পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে এদের অবদান বিপুল। ভারতে যারা এসেছিলেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাম হলো সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি সহ নাজি অধিকৃত দেশে দেশে বিপন্ন ইহুদিদের রক্ষা করতে জেসুইটদের অবদানও কখনও ভোলার নয়। বহু মানুষকে তাঁরা গোপনে আশ্রয় দিয়েছেন, প্রাণরক্ষা করেছেন। এমনকি হিটলারের জামানায়ও ইয়াদ ভাসেমের (Yad Vashem) নেতৃত্বে বারোজন জেসুইট পাদরি বহু ইহুদির প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। যে কারণে জেসুইটদের নাজি সরকার প্রবল শত্রু বলে মনে করত। অনেককেই ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল এবং মোট ১৫২ জেসুইট পাদরি 'হলোকাস্টে' নিহত হয়েছিলেন। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জেসুইটরা ২৬টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৪৬টি কলেজ চালান। ভারতে জেসুইটদের পরিচালিত উচ্চবিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৭৫। জেসুইটদের পরিচালিত নানা ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাই পৃথিবীতে সর্বাধিক।

ভ্যাটিক্যানের রক্ষণশীল মতামত আধুনিক দুনিয়ায় নানা ভাবে প্রশ্নের মুখে পড়তে থাকায় উদারনৈতিক জেসুইটদের গুরুত্ব বাড়তে থাকে চার্চের কাছে। আগেই বলা হয়েছে, ইউরোপের বাইরে, যেখানে আজ বিপুল সংখ্যক ক্যাথলিকের বাস— সেখানে জেসুইটদের প্রভাব সর্বাধিক কারণ তাঁরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ নানা সামাজিক ক্ষেত্রে প্রায় চারশো বছর ধরে বিপুল অবদান রেখেছেন। তাঁদের 'Good Will' ভ্যাটিকানের কাছে খুবই মূল্যবান। তাই বিগত দুই পোপ, দ্বিতীয় জন পল ও ষোড়শ বেনেডিক্ট দশ জন জেসুইট কার্ডিনালকে নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন। ২০০৫ সালে পোপ নির্বাচনেও জর্জ মারিও বার্গোগ্লিও ছিলেন, তবে দুই নম্বরে। আর ২০১৩-তে অতীতের সমস্ত প্রথা ভেঙে তিনিই মূল আসনে আসীন। অভূতপূর্ব ভাবে ষোড়শ বেনেডিক্টে-র পদত্যাগ এবং একজন জেসুইট কার্ডিনালের সর্বোচ্চ পদে বৃত হওয়া কি চার্চের তরফে হারানো জমি পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা? ৬টি মহাদেশের ১১২টি দেশে জেসুইটরা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রধান সম্প্রদায়। তাই রক্ষণশীল ধর্মীয় পরম্পরার মধ্যে নতুন পোপের নির্বাচন বর্তমানের বিশ্বায়িত আধুনিক দুনিয়ায় ভ্যাটিকানের অভিযোজন এবং যোগ্যতমের উদ্বর্তন (Survival of the Fittest)-এর প্রক্রিয়া বলে অনেকেই মনে করছেন।

এখানে একটা মজার কথা বলি। 'ঈশ্বর সৃষ্ট দুনিয়ায় ঈশ্বর সৃষ্ট জীবজগতে'-র ভিত্তি যার তত্ত্ব কাঁপিয়ে দিয়েছিল, তাঁর নাম চার্লস্ ডারউইন। প্রথাগত ভাবে ধর্মশিক্ষায় শিক্ষিত একজন পাদরি। ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection), যোগ্যতমের উদ্বর্তন (Survival of the Fittest) এবং প্রজাতির উদ্ভবের (Origin of species) তত্ত্ব আলাদা আলাদা ভাবে ঈশ্বর কর্তৃক বিভিন্ন প্রাণীর সৃষ্টির (Theory of Special creation) ধর্মভিত্তিক ধারণাকে একদম ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছিল। যেহেতু ডারউইনের স্ত্রী ও পরিবার ছিলেন গভীর ভাবে ধর্মবিশ্বাসী আর তাঁরা মানসিক আঘাত পাবেন বলে চার্লস্ ডারউইন নাকি মনুষ্য-প্রজাতির উদ্ভবের বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন, এমনটা বহু জীববিজ্ঞানীর ধারণা। সে যাই হোক, সাম্প্রতিক কালের চাহিদার কাছে নতিস্বীকার করে চার্চ ডারউইনের তত্ত্বকে আংশিক ভাবে মেনে নিলেও, খোদ আমেরিকারও ছ'টি ক্যাথলিক সংখ্যাগুরু প্রদেশে এখনও উচ্চবিদ্যালয়ে ডারউইনের জীববিজ্ঞানের তত্ত্ব পড়ানো নিষিদ্ধ। আর এক পাদরি গ্রেগর জোহান মেন্ডেল হলেন আধুনিক বংশগতি বিদ্যা (Genetics) -র প্রাণপুরুষ। তাঁরই পর্যবেক্ষণ ও সূত্রের উপর ভর করে গড়ে উঠেছে জীববিদ্যার বর্তমান সৌধ। দুই ধর্মতত্ত্ববিদের অবদান ঈশ্বরের আসনকে নাড়িয়ে দিয়েছে— এই অপ্রিয় সত্য ও প্যারাডক্স সম্পর্কে ভ্যাটিক্যান আজও নিশ্চুপ।

পোপ ফ্রান্সিস

নতুন পোপ সম্পর্কে যা যা তথ্য জানা গেছে, তাতে বোঝা যায় মানুষ হিসাবেও তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের থেকে অনেকটাই আলাদা। দীর্ঘদিন ধরে, পাদপ্রদীপের আলোকবৃত্তের বাইরে মানব সেবার কাজ করে চলেছেন এই কার্ডিনাল— এমনই জানানো হয়েছে ভ্যাটিক্যানের তরফে। এই পোপ সম্পূর্ণ বিলাস ব্যসনমুক্ত সাধারণ জীবনযাপন করেন, বরাদ্দ করা বিরাট রাজকীয় লিমুজিনের পরিবর্তে চার্চের সাধারণ বাসে চড়ে যাতায়াত করেন, একটি ছোটো ও অতি সাধারণ আবাসে থাকেন, নিজের রান্না নিজে করে খান। গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে নিয়মিত ভ্রমণ করা তাঁর কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। এই সব ভ্রমণে তিনি অতি সাধারণ কোনো আবাসে ওঠেন। পোপ ফ্রান্সিসের জীবনীকার সার্জিও রুবিন (Sergio Rubin) বলেছেন পোপ নয়া উদারনীতিবাদ ও আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (IMF)-এর কাজকর্মের বিরোধী— যদিও এর সমর্থনে কোনো প্রমাণ তিনি দাখিল করেননি। পোপ নিজের ব্যাগ নিজে বহন করেন এবং হোটেলের বিল নিজেই মেটান। ভক্তদের উদ্দেশ্যে বলার সময় তিনি লাতিনের পরিবর্তে ইতালীয় ভাষাতেই বেশি বলেন। অন্যান্য কার্ডিনালদের উদ্দেশ্যে ভাষণের সময় তিনি মনে করিয়ে দেন গরিব ও অসহায় মানুষের প্রতি যিশুর অপার করুণার কথা, তাদের সেবা করার কথা। পোপ ফ্র্যান্সিসের কথায়— 'স্বয়ং যিশু আমাদের অন্য ভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। বেরিয়ে পড়ুন। বেরিয়ে পড়ুন এবং মানুষের সুখ দুঃখের সাথী হন। তাঁদের সাথে মিশুন। তাঁদের কাছ থেকে জানুন। তাঁদের সেবা করুন।'

আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট নেস্টর কিচনার ও তাঁর স্ত্রী ক্রিস্টিনা কিচনার ফার্নান্ডেজের সঙ্গে পোপ ফ্রান্সিসের মতবিরোধের কথা সর্বজনজ্ঞাত। সমকামীদের মধ্যে বিবাহ (Gay Marriage) এবং ক্রিস্টিনার গর্ভনিরোধক ওষুধ (OIC Pill) বিতরণের কর্মকাণ্ডের বিরোধী এই পোপ। বহুবার ধর্ষণের ফলে গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভপাত (Abortion) আইনসম্মত করা নিয়েও পোপের বিরোধিতা আছে। আপাত-প্রগতিশীল পোপের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রপতি মধ্যযুগীয় বলে বর্ণনা করেছেন। পোপ অবশ্য এ-বিষয়ে নীরবই থেকেছেন। পোপের জীবনীকারের মতে, 'মারিও বার্গোগ্লিও কখনও কারও কথায় আক্রান্ত হলে বা

আঘাত পেলেও প্রত্যাঘাত করেন না।' নতুন পোপ সারা দুনিয়ার সামনে একজন ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিত, যিনি বিনয়ী এবং মাটির কাছাকাছি। মাণিক্যখচিত সিংহাসনের জায়গায় তাই তিনি বেছে নিয়েছিলেন সাধারণ একটি কেদারা।

পোপ এবং 'ডার্টি ওয়র'

১৯৭৬ থেকে ১৯৮৩ সাল আর্জেন্টিনার ইতিহাসে সামরিক অপশাসন, অত্যাচার, এবং হত্যার এক অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায় যা ডার্টি ওয়র নামে কুখ্যাত। এ-সময় আর্জেন্টিনার ক্ষমতা দখল করেছিল মার্কিন মদতপুষ্ট এক ভয়ঙ্কর সামরিক জুন্টা। মাত্র সাত বছরের মধ্যে ওই সামরিক শাসনে প্রায় কুড়ি হাজার মানুষ নিহত হন এবং আরও দশ হাজার মানুষ স্রেফ নিখোঁজ হয়ে যান। এদের অধিকাংশই ছিলেন বামপন্থী কর্মী, শহর ও গ্রামের মার্ক্সবাদী রাজনৈতিক দল ও গেরিলারা এবং এদের প্রতি সহানুভূতিশীল অসংখ্য সাধারণ মানুষ, ট্রেড ইউনিয়ানের সদস্য, ছাত্রছাত্রী, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীরা। অসংখ্য পুরুষ ও নারীকে গোপন বন্দি শিবিরে আটকে রাখা হয়, মহিলাদের উপর যৌন অত্যাচার চালানো হয়, শিশুদের কেড়ে নিয়ে মেরে ফেলা হয় বা সামরিক সরকারের ঘনিষ্ঠ পরিবারে ইচ্ছামতো দত্তক দিয়ে দেওয়া হয়। প্রায় ছোটোখাটো *আউশ্‌ভিচ* বন্দি শিবিরের মতো। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের এমন ভয়াবহ উদাহরণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিরল। আমেরিকা প্রযোজিত আর্জেন্টাইন অ্যান্টি কমিউনিস্ট অ্যালায়েন্স (Argentine Anti Communist Alliance) এই ভয়ংকর গণহত্যার রূপকার ছিল। প্রথমে জর্জ রাফায়েল ভিদেলা ও পরে রবার্তো ভায়োলা বে-আইনী গ্রেপ্তার, অত্যাচার, হত্যা ও গুম করে দেবার ভয়ংকর জমানা চালু করে। তারা এর নাম দেয় 'জাতীয় পুনর্গঠন' কর্মসূচি (ন্যাশনাল রিঅর্গানাইজেশন প্রসেস)। সামান্যতম সন্দেহের বসে বা ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করতে সামরিক বাহিনী বহু সাধারণ নাগরিককে গ্রেপ্তার, ধর্ষণ ও হত্যা করে। সমস্ত রাজনৈতিক বিরোধী পক্ষকে নিশ্চিহ্ন করতে এই বর্বর গৃহযুদ্ধ ডার্টি ওয়র নামে চিহ্নিত হয়। আর এ-কাজে আমেরিকার তদানীন্তন বিদেশ সচিব হেনরি কিসিংগার ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা সামরিক শাসকদের পুরো মদত দিয়েছিলেন। ৫ অক্টোবর, ১৯৭৬-এ হেনরি কিসিংগার আর্জেন্টিনার সামরিক সরকারের বিদেশমন্ত্রীকে বলেন— 'আমরা সাফল্য চাই এবং আমাদের পুরোনো নীতি হলো বন্ধুদের সমর্থন করা। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আপনাদের দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের নানা ঘটনা আমেরিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। আপনাদের গৃহযুদ্ধের কথা সবাই জানে না। আমরা স্থিতাবস্থা চাই কিন্তু আপনাদের অসুবিধায় ফেলতে চাই না। অতএব আমার উপদেশ, মার্কিন কংগ্রেস বাজেট ছাঁটাই করার আগেই আপনারা ব্যাপারটা ইতি করে ফেলুন।'

এক প্রখ্যাত মানবাধিকার আইনজীবী বুয়েনস্ আয়ারস এর উচ্চ ন্যায়ালয়ে ২০০৫ সালের ১৫ এপ্রিল একটি মামলা করেন— কার্ডিনাল জর্জ মারিও বার্গোগ্লিও গৃহযুদ্ধের দিনগুলিতে সামরিক শাসকদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। অন্তত এই ভয়াবহ ও নৃশংস শাসকদের নিবৃত্ত করার বা তাদের হাতে অত্যাচারিত বা নিহতদের বাঁচাবার কোনো চেষ্টা বর্তমান পোপ করেননি— যেমন করেছিলেন নাজি জামানাতে জার্মানি, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশের জেসুইটরা।

অরল্যান্ডো ওরিয়ো এবং ফ্রানসিস্কো জ্যালিকস বলে দু'জন জেসুইট পাদরিকে নৌবাহিনী বুয়েনস আয়ার্সের বস্তি অঞ্চল থেকে গ্রেপ্তার করে এবং বন্দিশিবিরে অকথ্য অত্যাচার করে হত্যা করে। এই দুই পাদরি-ই জর্জ মারিও বার্গোগ্লিও-র অধীনে কাজ করতেন। নতুন পোপ নির্বাচিত হবার পর নতুন করে আবার অভিযোগ উঠেছে যে এই দুই পাদরিকে বাঁচাবার জন্য কার্ডিনাল জর্জ কিছুই করেননি। সাংবাদিক হোরাসিও ভারবিট্স্কি তার বিখ্যাত বই *এল সাইলেন্সিও*-তে নির্দিষ্ট এই অভিযোগটি করেছেন যে, ওই দু'জন কার্ডিনাল বার্গোগ্লিওকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁদের প্রাণ বাঁচাতে। কিন্তু তাঁর ভূমিকা ছিল দ্বিচারিতামূলক। অবশ্য এর বিরোধিতা করে ব্রিটিশ সাংবাদিক রবার্ট কক্স বলেছেন, 'ওই সময়টা ভীষণ কঠিন ছিল। আমি মনে করি না, বার্গোগ্লিও তাঁদের ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু অবশ্যই তিনি ওই দুই পাদরিকে রক্ষা করার জন্যও সোচ্চার হননি।' রবার্ট কক্স ওই সময় *বুয়েনস্ আয়ারস হেরাল্ড*-এর সাংবাদিক ছিলেন এবং প্রাণ বাঁচাতে ১৯৭৯ সালে নর্থ ক্যারোলিনাতে পালিয়ে যান।

নিহত পাদরি অরল্যান্ডো ওরিওর বোন, গ্রাসিলিয়া বলেছেন, পোপ ফ্রান্সিসের নির্বাচনে তিনি হতবাক হয়ে গেছেন। নোবেল পুরস্কার জয়ী লেখক অ্যাডোল্ফ্ পেরেজ এস্কুইভেল বলেছেন, 'মারিও বার্গোগ্লিও সামরিক শাসকদের সহায়তা না করলেও, প্রতিবাদ করার সাহস তাঁর ছিল না।'

২০১০ সালে সামরিক শাসনে অত্যাচার, হত্যা ও অসংখ্য মানুষ নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার বিষয়ে যে কমিশন হয়, তাতে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য দিতে কার্ডিনাল বার্গোগ্লিও রাজি হননি। আর্জেন্টিনার আইনে যাজকদের এই সুযোগ আছে। পরে কমিশনের প্রতিনিধিরা তাঁর সঙ্গে দেখা করলে, তিনি নির্দিষ্ট ভাবে কোনো জবাব দেননি বলে আইনজীবী মারিয়াম ব্রেগম্যান জানিয়েছিলেন।

আর্জেন্টিনার হারিয়ে যাওয়া সন্তানদের মায়েদের সংগঠন 'গ্রান্দ মাদারস্ অফ দ্য প্লাজা দে মায়ো'-র এক পুত্রহারা মা জানিয়েছেন যে, তাঁর গর্ভবতী বোনকে বন্দিশিবিরে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। অসহায় পরিবারটি সে-সময় বার্গোগ্লিওর শরণাপন্ন হন আর এক জেসুইট যাজক পেদ্রো অররুপের মাধ্যমে। অথচ বার্গোগ্লিও দু'কলম একটি চিঠি লিখে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করেননি। ওই বোন ও তার সন্তানের, আদৌ যদি সে জন্মে থাকে, কোনো খোঁজ আর কখনও পাওয়া যায়নি।

আর এক যাজক ক্রিস্টিয়ান ভন ভার্নিখের বিরুদ্ধে ২০০৭ সালের কমিশনে প্রমাণ হয় যে, ওই পাদরি আশির দশকে পুলিশ অফিসার হিসাবে ৭টি হত্যাকাণ্ড, ৪২টি অপহরণ এবং ৩৪টি অত্যাচারের ঘটনার সঙ্গে জড়িত। অথচ কার্ডিনাল বার্গোগ্লিও তাকে পদচ্যুত করতে অস্বীকার করেন।

লাতিন আমেরিকায় জেসুইটদের এক অংশ নানা ধরণের অত্যাচারী শাসকদের অপশাসন এবং সামরিক বাহিনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন ও গৌরবময় ভূমিকা পালন করেছেন। এমনকি তাঁরা সরাসরি মার্ক্সবাদী গেরিলাদের সমর্থন করেছেন, আশ্রয় দিয়েছেন এবং রক্ষা করেছেন। এমনকি যিশুর ক্রুশবিদ্ধ মূর্তির উপর নিহত গেরিলার ছবি সেঁটে দিয়েছেন তাঁরা। দুনিয়া এদের জেনেছে লিবারাল থিওলজিস্ট বলে। কিন্তু পোপ ফ্রান্সিস সে পথে হাঁটেননি।

লিবারাল থিয়োলজি ও পোপ ফ্রান্সিস

১৯৭০-এর শেষ পাদে লাতিন আমেরিকায় বিভিন্ন দেশে একটা পোস্টার খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। ক্রুশবিদ্ধ যিশুর উপর একজন নিহত গেরিলা সৈন্যের ছবি। পোস্টারের বক্তব্য স্পষ্ট। ওই গেরিলা যোদ্ধা প্রাণ দিয়েছেন সাধারণ মানুষের মুক্তির জন্য— যেমন দিয়েছিলেন স্বয়ং যিশু।

বর্তমান দুনিয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য ১৯৬২ সালে পোপ ত্রয়োবিংশ জন আহুত দ্বিতীয় ভ্যাটিক্যান কাউন্সিল থেকেই চার্চের অচলায়তন ভাঙার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। ১৯৬৮ সালে লাতিন আমেরিকায় এপিস্কোপল কনফারেন্সে প্রখ্যাত যাজক গুস্তাভ গুতিরেজ (Gustavo Gutierrez), প্রথম লিবারাল থিয়োলজির ধারণা প্রচার করেন! তাঁর ও তাঁর অনুগামীদের মতে, লাতিন আমেরিকার 'উন্নতি' চেয়ে অত্যাচারী সরকার ও সাম্রাজ্যবাদী প্রথম বিশ্বের নাগপাশ থেকে মুক্তিই সে-সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। মেডেলিনের এই ধর্মীয় সমাবেশে বলা হয় 'হিংসা বর্জনীয় কিন্তু রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও সংগঠিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অনেক সময়ই তা প্রয়োজনীয় হিসাবে দেখা দেয়।' লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে মার্কিন মদতপুষ্ট অত্যাচারী সামরিক জুন্টাগুলির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ডাক দেয় এই সম্মিলন। ক্রমে এইসব যাজকেরা সমাজবাদী চিন্তার শরিক হয়ে পড়েন এবং লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে বামপন্থী গেরিলাদেরও সহযোগিতা করতে থাকেন কারণ তাঁরা সাধারণ গরিব মানুষের স্বার্থে লড়ছেন এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার দেশীয় গোমস্তাদের বিরোধিতা করছেন। বাইবেলের শিক্ষার সঙ্গে সাম্যবাদের তাত্ত্বিক যোগ সাধন করেন এই লিবারাল থিওলজিস্টরা। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এই প্রবন্ধে করার সুযোগ নেই। শুধু বলা যেতে পারে খ্রিস্টধর্মের ইতিহাসে এ এক অভূতপূর্ব অধ্যায়, যেখানে পাদরিরা সরাসরি হাতে অস্ত্র না তুলে নিলেও, সাধারণ মানুষের ও বামপন্থী গেরিলাদের সশস্ত্র সংগ্রামকে সর্বতোভাবে সমর্থন করেছেন– যেমন ভিয়েতনামে বৌদ্ধ সাধুরা করেছিলেন মার্কিন আগ্রাসন ও বর্বর হত্যালীলার দিনগুলিতে। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, নিকারাগুয়া, এল সালভাদোর সর্বত্র এই আধ্যাত্মিক অথচ বিপ্লবী চিন্তা ছড়িয়ে পড়েছিল। পেরুর গুস্তাভ গুতিরেজ এবং ব্রাজিলের লিওনার্দো বফ এর নাম এ বিষয়ে অগ্রগণ্য। দরিদ্র মানুষের পক্ষে এবং আর্থসামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে এই যাজকরা লড়াই করেছিলেন।

ভ্যাটিক্যান সর্বশক্তি দিয়ে লিবারাল থিওলজির বিরোধিতা করেছিল। ১৯৮৪ সালে তাই তারা এদের বিরুদ্ধে একটি ডিক্রি জারি করে। লাতিন আমেরিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যবাদী সামরিক নীতি রূপায়ণেও ভ্যাটিকানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল কারণ ওই মহাদেশের ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ মানুষই ছিলেন ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী। মার্কিন সংস্থা সিআইএ (CIA) ছিল এই কাজে প্রধান শরিক। ১৯৮৩ সালে *মাদার জোনস্* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি অনুসন্ধানে প্রমাণিত হয় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিশ্বের দেশে দেশে সমাজতন্ত্রের উত্থানকে ঠেকাবার জন্য সিআইএ অনেক যাজক ও বিশপকে নিয়মিত টাকা দিত। এদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক নানা গুপ্ত কাজকর্মে সিআইএ-র চর হিসেবেই কাজ করেছেন। নানা নথিপত্র থেকে প্রমাণ হয়েছে খোদ ভ্যাটিকানেও এদের 'বিশেষ ইউনিট' ছিল। চার্চে রক্ষণশীল ও উদারনৈতিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করাই ছিল সিআইএ-র কৌশল। লাতিন আমেরিকায় নানা রক্ষণশীল ধর্মীয় সংগঠন বা গুপ্ত সংগঠনকে সিআইএ নিয়মিত অর্থ সরবরাহ করত। যেমন চিলির 'ওপাস দাই' (Opus Dei) মার্কিন প্রযোজিত ১৯৭৩ সালের প্রতিবিপ্লবে এবং আলেন্দের হত্যার পর অগুস্তো পিনোচেট-এর বর্বর সরকারে অংশ নেয়। বলিভিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সহায়তায় সিআইএ কুখ্যাত 'বনজার (Banzer) পরিকল্পনা' করেছিল— যার উদ্দেশ্য ছিল প্রায় পঞ্চাশজন প্রগতিশীল ও উদারনৈতিক যাজককে হত্যা করা। মার্কিন প্রশাসন 'লিবারাল থিওলজি' আন্দোলনের মধ্যে সমাজতন্ত্রের ভূত দেখত এবং তাকে টুঁটি টিপে মারার উদ্দেশ্যে চার্চের ভেতরের প্রগতিশীল অংশকে হত্যা করতেও পিছপা হয়নি।

বর্তমান পোপ ফ্রান্সিস বুয়েনস আয়ারস্-এর প্রধান বিশপ হলেও আর্জেন্টিনার লিবারাল থিওলজি আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। ভ্যাটিকানের সঙ্গে এদের তীব্র দ্বন্দ্বে তিনি ছিলেন ভ্যাটিকানের একনিষ্ঠ সমর্থক— এটাই আর্জেন্টিনার ইতিহাসবিদদের মত। গরিব মানুষদের সপক্ষে কথা বললেও তাদের এই দুর্দশার কারণ যে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও একনায়কতন্ত্রের অত্যাচার, তা কার্ডিনাল বার্গোগ্লিও কখনই স্বীকার করেননি। দরিদ্র মানুষের উচিত প্রতিবাদ করা বা বন্দুক ধরে জীবনের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া নয়, প্রাণপণে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা— এই ছিল তাঁর মত।

পোপের পদে দ্বিতীয় জন পলের আরোহণই আসলে সংরক্ষণশীলতার নতুন অধ্যায় সূচনা করেছিল। মুখে দরিদ্র মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও পোপ দ্বিতীয় জন পল ছিলেন দারুণ ভাবে রক্ষণশীল, সমাজতন্ত্র ও লিবারাল থিয়োলজির চূড়ান্ত বিরোধী এবং পিতৃভূমি পোল্যান্ডে সমাজতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করে লেখ ভালেসা-র 'সলিডারিটি'-র সরকার স্থাপনের এক প্রধান রূপকার। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগনের সঙ্গে তাঁর নৈকট্য ও সখ্য প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়েছে। রেগন মসনদে বসার প্রথম মাসেই জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের (National Security Council) এক বর্ধিত সভা ডাকেন— যার মূল আলোচ্য বিষয় ছিল 'লিবারাল থিওলজির বিপদ।' আর দ্বিতীয় জন পল একদিকে রাজনীতিতে চার্চের অংশগ্রহণের তিক্ত সমালোচক ছিলেন, অন্যদিকে রোনাল্ডের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পোল্যান্ড থেকে সমাজতন্ত্র হঠানোকে তিনি প্রায় ধর্মযুদ্ধের মতই গ্রহণ করেছিলেন। ভ্যাটিকানে তিনি কলম্বিয়ার আলফানসো লোপেজ ট্রুজিলো বলে 'ওপাস দাই' গুপ্ত সংগঠনের এক সদস্যকে কার্ডিনাল হিসাবে নির্বাচন করেন—যার প্রধান কাজ ছিল লিবারাল থিয়োলজির প্রবক্তাদের প্রভাব খর্ব করা। পরবর্তী পোপ বেনেডিক্ট-এর সময়ও এই রক্ষণশীল প্রবণতা চালু থাকে। তিনিও বহু উদারনৈতিক যাজককে বরখাস্ত বা পদচ্যুত করেন।

এই পুরো সময়টায় আর্জেন্টিনার একজন অতি গুরুত্বপূর্ণ কার্ডিনাল ও পরে আর্চবিশপ হিসাবে বর্তমান পোপের ভূমিকা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। যেমন সামরিক জুন্টার সঙ্গে সহযোগিতা থেকে চার্চের প্রগতিশীল অংশের বিরোধিতা, বা তুমল রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় মধ্যপন্থা অবলম্বন ইত্যাদি। সব মিলিয়ে তাই লাতিন আমেরিকায় ভ্যাটিকানের খর্বিত প্রভাব পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির ফাদার ফ্রান্সিসই যে যোগ্যতম, তাতে আর সন্দেহ কি! □

দুর্বার ভাবনা

পত্রিকার এজেন্সি নিতে চান যাঁরা সরাসরি আমাদের ঠিকানায়
যোগাযোগ করুন বা ফোন করুন ০৮৪২০ ০৬৬৫৯৪
অথবা ০৩৩ ২৫৪৩ ৭৫৬০ এই নম্বরে।

বার্ষিক রচনাপঞ্জী মে ২০১২- এপ্রিল ২০১৩

রচনার নাম/লেখক	সংখ্যা/পৃষ্ঠা
অ	
অথ চিট ফান্ড কথা/ব্যাসদেব দাশগুপ্ত	মে ২০১২/২৬
অ সু খ - বি সু খ / রো গ - বা লা ই	
কৃমি সংক্রমণ/পুণ্যব্রত গুণ	জুলাই ২০১২/২৯
জানার কথা ডায়রিয়া/পুণ্যব্রত গুণ	জুন ২০১২/২৯
পেপটিক আলসার এখন ততটা বিপজ্জনক নয়/ঐ	অগাস্ট ২০১২/২০
পেশাগত শ্বাসরোগ/পুণ্যব্রত গুণ	ডিসেম্বর ২০১২/২৯
ব্যথা যখন কোমরে/পুণ্যব্রত গুণ	মার্চ ২০১৩/২৫
যক্ষ্মা কেন ভয়ংকর?/ পুণ্যব্রত গুণ	ফেব্রুয়ারি ২০১৩/২৯
রক্তাল্পতা : অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপুষ্টির এক বহিঃপ্রকাশ/ঐ	অক্টো-নভে. ২০১২/৬৩
সমস্যা যখন কাশি/ পুণ্যব্রত গুণ	সেপ্টে. ২০১২/২৩
আ	
আইপিএলের আর্থিক দুর্নীতি/মানসকুমার ঠাকুর	জুন ২০১২/১১
আদিবাসী গ্রামে মৃত্যু দূত সিলিকোসিস/ চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য	অক্টো-নভে. ২০১২/৬১
আমুর ফ্যালকনের নৃশংস গণহত্যা নাগাল্যান্ডে/ চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য	ডিসেম্বর ২০১২/১১
উ	
উচ্ছিন্ন মানুষদের কাছে নতুন করে গণতন্ত্রের.../শঙ্কর রায়	মে ২০১২/৩১
উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার চারটি ব্লকে... অপুষ্টির শিকার/রবি রায়	অক্টো-নভে. ২০১২/১৩
উত্তরবঙ্গের চা শিল্প : সূচনা ও সংকটের গল্প/ অজিত কুমার রায়	জানুয়ারি ২০১৩/২৪
উনিশ শতকের বাংলার চাষি : এক অক্ষয় আর্কিটাইপ/তরুণ বসু	এপ্রিল ২০১৩/১৭
এ	
এঁরাও মানুষ/মৃণালকান্তি দত্ত	অগাস্ট ২০১২/৮
এখনও নির্বাসনে যেতে হয় মেয়েদের/ রুম্পা চৌধুরী	অক্টো-নভে. ২০১২/৩৭
ও	
ও গঙ্গা তুমি বইছ কেন/কল্যাণ রুদ্র	জুলাই ২০১২/১৭
ওষুধশিল্পে বিদেশী পুঁজি : সর্বনাশের ইতিকথা/ সিদ্ধার্থ গুপ্ত	ফেব্রুয়ারি ২০১৩/১৯
ওষুধের অনৈতিক ও বেআইনি বাজারজাতকরণের/...	জুলাই ২০১২/৩০
ওষুধের নাগাল মিলবে কবে, কিভাবে/শুভজিৎ ভট্টাচার্য	মার্চ ২০১৩/১৯
ও রা কা জ ক রে লো কস্ট : এক স্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যপ্রতিষ্ঠান/ মিত্রা মুখোপাধ্যায়	অক্টো-নভে. ২০১২/৬৮
ক	
কম্বোডিয়ায় পাচার প্রচার পাচ্ছে/মিত্রা মুখোপাধ্যায়	ডিসেম্বর ২০১২/২৪
কয়লা খাদানের কথা/আত্রেয়ী বসু রায়	মে ২০১২/১৭
কৃষির বিকাশ জিনতত্ত্ব এবং জিনপ্রযুক্তি/তুষার সিংহ	সেপ্টে. ২০১২/১৭
কৃষি সংকট ও জিন প্রযুক্তি/দেবীন্দর শর্মা	মার্চ ২০১৩/১১
কৃষি সংকট ও জিন প্রযুক্তি/পুষ্প মিত্র ভার্গব	এপ্রিল ২০১৩/২১
কোকরাঝাড় দাঙ্গা : একটি অনুসন্ধান প্রতিবেদন/ শুভপ্রতিম রায়চৌধুরী	সেপ্টে. ২০১২/৫
ক্রিকেটের আদিগন্ত/ অরণি চট্টোপাধ্যায়	জুন ২০১২/৭
ক্ষমতার দম্ভ :দলিতের উপর আক্রমণ/গোলাপ দাশগুপ্ত	জানু. ২০১৩/১৭
খ	
খুচরো ব্যবসায় এফডিআই : কৃষিতে কর্পোরেটরাজ/ অভী দত্ত মজুমদার	অক্টো-নভে. ২০১২/৪৫
জ	
জনস্বাস্থ্যের দাবিতে জুনিয়র ডাক্তাররা যেদিন/পুণ্যব্রত গুণ	মে ২০১২/১২
জীবন যন্ত্রণায় পাহাড়িয়া উপজাতি/ চণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায়	এপ্রিল ২০১৩/১১
ট	
টয়লেট—মন্দির বিতর্ক/বিপ্লব মাজী	ডিসেম্বর ২০১২/৪
ড	
ডা কে র চি ঠি পৃথিবীর আদিমতম ভণ্ডামো	মার্চ ২০১৩/৩২
ত	
তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫	ফেব্রুয়ারি ২০১৩/৩১
দ	
দারিদ্র্য রেখা : সুগভীর ছকে বিপন্ন দরিদ্র /সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়	মে ২০১২/২৭
দিল্লি ধর্ষণ-কাণ্ড এবং তারপর/অরণি চট্টোপাধ্যায়	ফেব্রুয়ারি ২০১৩/১৭
দিল্লির নির্মাণ শ্রমিকদের কথা/আরধনা ডালমিয়া	সেপ্টে. ২০১২/ ৭
দুবরাজপুর পুলিশ ফায়ারিং/শুভ্রপ্রতিম রায়চৌধুরী	ডিসেম্বর ২০১২/১
দুর্নীতির অন্তরালে/সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়	সেপ্টে. ২০১২/১৪
দৈব নির্ভর ভারতীয় অর্থনীতি/বিপ্লব মাজী	অগাস্ট ২০১২/১৩
দূষণ : প্রাকৃতিক ও মানবিক/বিজয় কুমার দত্ত	জুলাই ২০১২/২৭
ধ	
ধর্ষণের বলয় গ্রাসে ভারতীয় সংস্কৃতি/বিপ্লব মাজী	জানুয়ারি ২০১৩/৭
ন	
নতুন আলো/পারমিতা চৌধুরী	জুলাই ২০১২/২১
নতুন পোপ নির্বাচন : ধর্মতত্ত্ব না রাজনীতি?/ সিদ্ধার্থ গুপ্ত	এপ্রিল ২০১৩/২৬
নুলো পুঁজিবাদের বাহন আইপিএল/শঙ্কর রায়	জুন ২০১২/৯
প	
পদ্মা-ভাঙনের বলি চরপরাশপুরের মানুষ/শুভপ্রতিম রায়চৌধুরী	মে ২০১২/৯

রচনার নাম/লেখক	সংখ্যা/পৃষ্ঠা
প র বা সে র চি ঠি	
খাবার নিয়ে ভাবা:বিদেশ-বিভুঁইয়ে/সীমন্তী দাশগুপ্ত	জুলাই ২০১২/৩১
পরমাণু বিদ্যুৎ নয় — /বঙ্কিম দত্ত, অর্জুন সেনগুপ্ত	ডিসেম্বর ২০১২/২৭
পরমাণু বিরোধী আন্দোলন:কুড়ানকুলাম/প্রদীপ দত্ত	অক্টো-নভে. ২০১২/৫৮
পুরুষের যৌনতা/মৃণালকান্তি দত্ত	মে ২০১২/৪
পশ্চিমবঙ্গের বাজেট ২০১৩-১৪ : বিশ্লেষণ/ সরজিৎ মজুমদার	এপ্রিল ২০১৩/১৫
পুষ্টি— পুষ্টি এবং শিশু পুষ্টি সমীক্ষা/কৃষ্ণা রায়	অগাস্ট ২০১২/১৮
প্র তি বে দ ন	
কলকাতা মিলন মেলার বই মেলায়/তরুণ বসু	মার্চ ২০১৩/৩১
প্রসঙ্গ : অপুষ্টি ও অনাহার/সিদ্ধার্থ গুপ্ত, সোমা গুপ্ত	অক্টো-নভে. ২০১২/৯
প্রান্তবাসী মানুষদের জন্যে চাই স্পোর্টস/সন্দীপ পুরকায়েত	জুন ২০১২/১৫
প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বাচ্চাদের শিক্ষার হালচাল/ পারমিতা চৌধুরী	অক্টো-নভে. ২০১২/২১
প্রেম যে কী তা.../অনামিকা সেন	মার্চ ২০১৩/৬
ফ	
ফর্সা হবার জ্বালা/জয়ন্ত দাস	অক্টো-নভে. ২০১২/৬৬
ব	
ব ই প ড়া র ক থা / প ড়া ব ই য়ে র ক থা	
জল জঙ্গলের, আর মানুষের জলছবি/তরুণ বসু	অগাস্ট ২০১২/৩১
বন, আদিবাসী ও অধিকার/সৌমিত্র ঘোষ	ডিসেম্বর ২০১২/১৩
বর্ষার ছন্দপতন কীসের ইঙ্গিতবাহী?/কল্যাণ রুদ্র	সেপ্টে. ২০১২/৪
বাঁকুড়ার বনকথা (পর্যায় :১) (ধারাবাহিক রচনা)/ সুদীপ্ত পোড়েল	জুলাই ২০১২/৯
বাঁকুড়ার বনকথা (পর্যায় :২) (ঐ) /সুদীপ্ত পোড়েল	অগাস্ট ২০১২/২৩
বাঁকুড়ার বনকথা (পর্যায় :৩) (ঐ) /সুদীপ্ত পোড়েল	সেপ্টে. ২০১২/২৫
বাঘের আক্রমণে মৃত কাঁকড়া শিকারিদের/ শঙ্কর কুমার প্রামাণিক	অগাস্ট ২০১২/১৫
বাজার অর্থনীতি চায় দু'টি শরীর হয়ে উঠুক দুটি যৌনযন্ত্র/জয়া মিত্র	জানুয়ারি ২০১৩/১১
বিকিনি ক্রিকেটের রহস্যভেদ/চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য	জুন ২০১২/১৩
বিজ্ঞান কি খেটে খাওয়া ঘরের ছেলেমেয়ে.../ দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী	জুলাই ২০১২/২৩
বিকল্প রুজির সন্ধানে : জাল ছেড়ে বেলচা/ শঙ্কর কুমার প্রামাণিক	ডিসেম্বর ২০১২/২০
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্মৃত প্রতিষ্ঠাতা/ অভিজিৎ গুহ	এপ্রিল ২০১৩/১২
বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ—কিছু কথা/ব্যাসদেব দাশগুপ্ত	জানুয়ারি ২০১৩/২৯
বিপন্ন খুচরো ব্যবসা : কার স্বার্থে সরকার/ সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়	অক্টো-নভে. ২০১২/৫১
ব্রাত্য জন-কথা : প্রসঙ্গ 'প্রশাসক' মানসিকতা/ তরুণ বসু	ফেব্রুয়ারি ২০১৩/৫
ব্রাত্যজনই ব্রাত্যজনের সহায়—উঁচুতলা থাকে ... / অশোক দত্ত	ফেব্রুয়ারি ২০১৩/১৫
ব্রাত্যজনের বজ্রনির্ঘোষ/ভারতী দে ও রীতা রায়	ফেব্রুয়ারি ২০১৩/৮
ভ	
ভাঙরদহ বিল : জল জীবন, জলজ-জীবিকা/ শুভপ্রতিম রায়চৌধুরী	অক্টো-নভে. ২০১২/২৩
'ভিখারি আজও ঘরে ফেরে নাই!'/কিরীটি রায়	জানুয়ারি ২০১৩/৪
ভুবনায়ন যজ্ঞ ও আমাদের পরিবেশ/অশোকেন্দু সেনগুপ্ত	জুন ২০১২/২৪
ভূপাল : ২৮ বছরের সংগ্রাম/অরণি চট্টোপাধ্যায়	ডিসেম্বর ২০১২/ ৫
ম	
মরণোত্তর দেহ-দানের অঙ্গীকার/শঙ্করকুমার প্রামাণিক	ফেব্রুয়ারি ২০১৩/২৩
মাটির নীচে জল : ক্রমশই নিম্নগামী/ কল্যাণ রুদ্র	অক্টো-নভে. ২০১২/ ৭
মানুষ কি পণ্যের দাস/স্মরজিৎ জানা	অক্টো-নভে. ২০১২/৩৯
মানুষের জন্য বিদ্যুৎ : জোগান ও চাহিদার ফারাক/ শঙ্কর কুমার প্রামাণিক	জানুয়ারি ২০১৩/৩১
মুক্তধারা থেকে নর্মদা : নদীর অপ্রতিহত.../কল্যাণ রুদ্র	জুন ২০১২/২০
মুনাফার পণ্য জল : বিপন্ন মানুষ/ সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়	জুন ২০১২/১৭
য/য়	
যৌনকর্মী—অপরাধী না অত্যাচারিতা/ পারমিতা চৌধুরী	ডিসেম্বর ২০১২/২৩
যৌন হেনস্তা ও মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতা	জানুয়ারি ২০১৩/১৮
র	
রঙিন বিপদ/জ্যোতির্ময় সমাজদার, স্মরজিৎ জানা	সেপ্টে. ২০১২/২০
রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বলি এক আদিবাসী নারী/তরুণ বসু	জুলাই ২০১২/৪
ল	
লভ্-হোটেল : জাপানে যৌন বিলাসের আধুনিক.../ মিত্রা মুখোপাধ্যায়	মার্চ ২০১৩/৪
লালি দেবীর জন্যে কোনো মোমবাতি প্রতিবাদ নেই/বদ্রি নারায়ণ	জানুয়ারি ২০১৩/১৩
লোধা শবরীর পদাবলী/দুলাল দে	ফেব্রুয়ারি ২০১৩/১১
শ	
শবর প্রসঙ্গ/জগবন্ধু ভট্টাচার্য	জানুয়ারি ২০১৩/২১
শবর পরিচিতি/গোপীবল্লভ সিংদেও	এপ্রিল ২০১৩/৯
শাহবাগ আন্দোলনের প্রেক্ষিত, ভবিষ্যত ও বামপন্থীদের ভূমিকা... /চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য	এপ্রিল ২০১৩/৫
শাহবাগ ও নবীন প্রজন্ম/বিপ্লব মাজী	এপ্রিল ২০১৩/৪
শিক্ষা কি আদৌ মৌলিক অধিকার হলো?/ রবি রায়	জুলাই ২০১২/২৫
শিক্ষা, বৈষম্য এবং রাজনীতি/ব্রতীন চট্টোপাধ্যায়	মার্চ ২০১৩/১৭
শিল্পের দূষণে ভারতের প্রথম সারির শিল্পাঞ্চল/ তরুণ বসু	ডিসেম্বর ২০১২/৯
শিশু ও কিশোর মনের অপুষ্টি/ দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী	অক্টো-নভে. ২০১২/১৫
শিশুর স্বাধীনতা ও দাসত্ব/ব্রতীন চট্টোপাধ্যায়	অক্টো-নভে. ২০১২/১৭
শৈশব-কৈশোরের মানসিক স্বাস্থ্য এবং তার সমস্যা (সংকলন)	ফেব্রুয়ারি ২০১৩/২৬
শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত অধিকার/নব দত্ত	জুন ২০১২/২৮

র - গ্রা মে

রচনার নাম/লেখক	সংখ্যা/পৃষ্ঠা
স	
সত্তার সীমানা/শাশ্বতী ঘোষ	অগাস্ট ২০১২/৫
সমস্ত রাস্তাই ক্লিন্ন/মিত্রা মুখোপাধ্যায়	জানুয়ারি ২০১৩/১৪
সম্রাট নিরোর অতিথি/তরুণ বসু	জুন ২০১২/৪
সম্পাদকীয়	
অপুষ্টির উৎস সন্ধানে/স্মরজিৎ জানা	অক্টো-নভে. ২০১২/৩
আর এক দুঃস্বপ্নের নগরী/ঐ	ডিসেম্বর ২০১২/১
উধাও ভালোবাসা/ঐ	মার্চ ২০১৩/১
এ লজ্জা ঢাকব কোথায়!/ঐ	জুলাই ২০১২/১
কাজের মর্যাদা ও মজুরি/ঐ	মে ২০১২/১
খেলা খেলা সারা বেলা/ঐ	জুন ২০১২/১
ধর্ষণ সংস্কৃতি/ঐ	জানুয়ারি ২০১৩/১
বাবুদের বুদ্ধি দ্যাখ্ মগZ/ঐ	সেপ্টে. ২০১২/১
বৈষম্যের প্রজাতন্ত্র /ঐ	ফেব্রুয়ারি ২০১৩/১
শাহবাগ ও ধর্মযুদ্ধ/ঐ	এপ্রিল ২০১৩/১
সেই ট্রাডিশন সমানে চলছে/স্মরজিৎ জানা	অগাস্ট ২০১২/১
সংগ্রহ	
'তুমি জানো না দক্ষিণ আমেরিকায় মেয়ে'/ শঙ্খ ঘোষ	অগাস্ট ২০১২/১১
সংসার সীমান্তের সাথীরা : যৌনকর্মীর অধিকারের/ শাশ্বতী ঘোষ	অক্টো-নভে. ২০১২/৩২
সেও আমি নই : ওকাম্পো/শঙ্খ ঘোষ	জানুয়ারি ২০১৩/৫
সংবাদ : বিশ্বে - দেশে - রাজ্যে - শহরে - গ্রামে	
অপ্রয়োজনীয় ওষুধের অপব্যবহার রুখতে পারে সচেতনতা	অক্টো-নভে. ২০১২/৭০
ওষুধ কোম্পানি গ্ল্যাক্সোর কেলেঙ্কারি	অগাস্ট ২০১২/২৮
ওষুধে আসক্তি বাড়াচ্ছে	মার্চ ২০১৩/২৭
কলকাতায় প্রান্তবাসীর ফ্রিডম ফেস্টিভাল	সেপ্টে. ২০১২/৩১
কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তায় পশ্চিমবঙ্গ এখনও পিছনের সারিতে	মার্চ ২০১৩/২৯
কুড়ি ঘণ্টার বেশি টিভি দেখা, বাড়িয়ে দিচ্ছে পুরুষের বন্ধ্যাত্ব	মার্চ ২০১৩/ ৩০
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মতে, ছত্তীসগঢ়ে সতেরো জন...	অগাস্ট ২০১২/২৮

রচনার নাম/লেখক	সংখ্যা/পৃষ্ঠা
'চিট ফান্ড কি ও কেন' নিয়ে আলোচনা সভা	অগাস্ট ২০১২/২৯
জাপানে পরমাণু চুল্লি বন্ধ হলো/প্রদীপ দত্ত	জুন ২০১২/৩১
দম্পতি নয় ভাইবোন হয়েই থাকতে হবে	মার্চ ২০১৩/৩০
ধর্মবিরোধী আইনে অভিযুক্ত এক এগারো বছরের মেয়ে	সেপ্টে. ২০১২/৩০
পাইরেট পার্টি : ক্রমশই উদয়ের পথে	অক্টো-নভে. ২০১২/৭১
বাচ্চাদের জন্যে ঘি একটি...	মার্চ ২০১৩/২৭
বৃহৎ ওষুধ কোম্পানির নোংরা চক্রান্ত	সেপ্টে. ২০১২/৩০
ভূপাল : গ্যাসপীড়িতদের অভিনব প্রতিবাদ	অগাস্ট ২০১২/২৯
শ্রমিক নেতা শংকর গুহনিয়োগীর...	ডিসেম্বর ২০১২/৩১
সোনি সোরির মুক্তির দাবিতে গণ কনভেনশান	অগাস্ট ২০১২/৩০
EIMF-এর বিশ্ব এইড্স দিবস উদ্যাপন	মার্চ ২০১৩/৩০
সাক্ষাৎকার	
বীরভূমের পাথর খাদান আন্দোলন/ জয়া মিত্র-র সঙ্গে তরুণ বসু	মে ২০১২/২১
সিকি মানুষ/তরুণ বসু	মে ২০১২/১৫
সুধীর ধাবালে—এক দলিত 'বিনায়ক সেন'/ অরণি চট্টোপাধ্যায়	জুলাই ২০১২/৭
সুন্দরবনে থোপার মহিলা কাঁকড়া শিকারি/ শঙ্কর কুমার প্রামাণিক	জুলাই ২০১২/১৩
সুন্দরবনে কাঁকড়া শিকার ও বিএলসি/ শংকর কুমার প্রামাণিক	সেপ্টে. ২০১২/১১
সোনি সোরি-র মুক্তির দাবিতে প্রতিবাদ সভা/ অহল্যা বসুগুপ্ত	ফেব্রুয়ারি ২০১৩/৪
স্টোনওয়াল সংঘর্ষ, ১৯৬৯-এর ২৮ জুন/ মিত্রা মুখোপাধ্যায়	অগাস্ট ২০১২/১০
স্বাধীন ভারত বহুজাতিকের কাছে বাঁধা পড়ছে/ বিপ্লব মাজী	অক্টো-নভে. ২০১২/৫৫
স্মরণ	
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : একজন যৌনকর্মীর চোখে/ ভারতী দে	ডিসেম্বর ২০১২/১২
হ	
হাঁড়া জেলেপাড়া/ শঙ্করকুমার প্রমাণিক	অক্টো-নভে. ২০১২/২৭

দুর্বার প্রকাশনীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই

অধিকার ভাবনা সম্পাদনা : **শুভেন্দু দাশগুপ্ত** ও **স্মরজিৎ জানা** দাম : ৮০ টাকা

নারী ভাবনার বাইশ কথা সম্পাদনা : **তরুণ বসু** ও **ভারতী দে** দাম : ১০০ টাকা

চেনা দেশ অচেনা মানুষ **স্মরজিৎ জানা** দাম ২০০ টাকা ভিন্ন নারী অন্য স্বর **তরুণ বসু** দাম ৪০ টাকা

পাওয়া যাবে : দুর্বার প্রকাশনী, ৪৪ বলরাম দে স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৬-এ। এ ছাড়াও কলেজ স্ট্রিটে দে বুক স্টোর, মণীষা গ্রন্থালয়। মেদিনীপুরে ভুর্জপত্র। শান্তিনিকেতনে সুবর্ণরেখা। ও অন্যত্র। এবং কলকাতা বইমেলায় ১৪৯ নম্বর স্টলে